গঙ্গা মাইয়া

আদান প্রদান

গঙ্গা মাইয়া

ভৈরব প্রসাদ গুপ্ত

অনুবাদ

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

স্বাধীনতার পরে হিন্দী উপন্যাসের যে নতুন ধারা প্রবর্তিত হ'ল, তার মূলে ছিল গ্রামের প্রতি এক নতুন চেতনা, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। একে আমরা সেই সংগ্রামী মানসিকতারই বৃহত্তর প্রতিফলন মনে করতে পারি, কেননা মহাত্মা গান্ধী গ্রামকেই দেশের 'হৃদয়-প্রদেশ' বলে মানতেন, এবং তাঁর নিজস্ব সংগ্রামের সূত্রপাত সেখানেই করেছিলেন। মুন্সী প্রেমচঁন্দ ছিলেন এই ধারার উপন্যাস রচয়িতাদের অগ্রদূত।

এই ধারার একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো গ্রামমাত্রকে সমান ও সামান্য রূপে না দেখে, কোনো একটি গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র করে সেখানকার জাতীয় প্রবৃত্তির মানবিক ও আর্থিক সম্বন্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করা। সেই কারণে এই উপন্যাসগুলিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবেশ ঘটেছে।

এরই সঙ্গে হিন্দী উপন্যাসে আধুনিকতারও প্রবেশ ঘটেছিল। সেখানে ঐতিহ্য থেকে সরে আসার, ও তাকে হেয় জ্ঞান করার একটি প্রবণতা সমান্তরাল ভাবে দেখা গিয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এই ধারা ছিল নগরকেন্দ্রিক।

অতএব গ্রামাঞ্চল কেন্দ্রিক উপন্যাসকেই ভারতীয় উপন্যাসের মূল ধারা রূপে চিহ্নিত করা যায়। 'গঙ্গা মাইয়া' এই ধারার প্রারম্ভিক যুগের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

শীর্ষক থেকেই বোঝা যায় যে লেখক ঐতিহ্যকে একটি প্রবহমান ধারা রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, যা পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানব-জীবনকে নতুন উৎসাহ ও উর্বরতা দান করে এসেছে। এই দৃষ্টিতে দেখলে 'গঙ্গা মাইয়া' প্রতীক ধর্মী উপন্যাস। এই উপন্যাসে গঙ্গাকে একটি 'মীথে'র চেয়ে বেশী ব্যাপক প্রেক্ষাপটে প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে এই 'মীথে'র একটি রচনাত্মক নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ উপন্যাসটি এই ব্যাখ্যারই সৃজনাত্মক প্রকাশ। এখানে গঙ্গাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, আর এটাই এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। গঙ্গাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তাকে মানবী রূপে উপস্থাপিত করা হয়নি, সাধারণত পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে যেমন দেখা যায়; বরং গঙ্গা তার চূড়ান্ত বাস্তব রূপেই উপস্থাপিত। বাস্তবে এমনটাই ঘটতে দেখা যায়,—যখনই বন্যা আসে তখন নদী যতটা বিনাশ করে, সাধারণত ততটাই উর্বর ভূমি ফিরিয়ে দিয়ে যায়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মটরুর জীবনের সঙ্গে যুক্ত ঘটনাক্রম এই তথ্যকেই সমর্থন করে। অঞ্চল বিশেষে গঙ্গার এই দানের সবিশেষ মহত্ত্ব আছে,—আর

এই কারণেই সে 'মা'। লেখক তাঁর কাহিনীতে ভাবালুতাকে সতর্কভাবে পরিহার করেছেন। 'গঙ্গা' এখানে যতটা জল, ততটাই মাটি। মটরু গঙ্গাকে যতটা ভালোবাসে, ততটাই ভালোবাসে তার তীরবর্তী ভূমিকে।

আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের বিপরীত, এখানে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়, কারণ প্রকৃতিই তার অস্তিত্বের অনিবার্য স্রোত। লেখক বারংবার তাঁর কাহিনীতে গ্রামাঞ্চলের জল, মাটি, হাওয়ার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে কোনো রোমান্টিক আবেগ বশত নয়, বরং তাঁর কাহিনীর পটভূমিতে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে যে সহজ সম্বন্ধ, যা প্রকারান্তরে সেখানকার মানুষের ভাববোধ ও জীবন পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে, তারই প্রতি একটি সংকেত।

স্বল্প পরিসরের মধ্যেই 'গঙ্গা মাইয়া'র কাহিনী তিনটি স্তরে বিধৃত। উপন্যাসের একটি উদ্দেশ্য সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সংঘর্ষের একটি চিত্র অঙ্কিত করা, যা গোপী, গোপীর বৌদি ও তার পরিবারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যখনই কোনো ঔপন্যাসিক কোনো একটি জনপদকে তার কাহিনীর কেন্দ্র রূপে উপস্থাপিত করেন, তখন অনিবার্য ভাবেই তাঁকে কোনো একটি পরিবারের কাহিনী শোনাতে হয়। গোপীর প্রথানিষ্ঠ, ক্ষত্রিয় পরিবারে যেমন একদিকে পরিবার ভেঙে যায়, তেমনি অন্যদিকে প্রচলিত প্রথারও ভাঙন ধরে। লেখক প্রগতিশীল, তাঁর বিচারবোধ সম্পূর্ণ উপন্যাসটিতে অন্তর্ধারা রূপে প্রবাহিত। এইভাবে আমরা একটি মার্মিক প্রেমগাথাও শুনতে পাই। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার পতনকে চিত্রিত করা। যে কোনো নির্মাণের পূর্বে এই পতন অবশ্যম্ভাবী।

ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য শুধু কোনো একটি জনপদের গৌরব কাহিনী শোনানো মাত্র নয়, সেই কারণে এই জনপদের লোকগুলিকে যেমন নির্ভীক, স্বচ্ছন্দ, ও স্বাস্থ্যবান বলা হয়েছে, মানসিক ভাবে তারা যে পিছিয়ে আছে একথাও জানানো হয়েছে। তাদের সারল্য প্রায় মূঢ়তার কাছাকাছি। এই মূঢ়তার জন্যেই তারা অনেক বিপদের সম্মুখীন হয় ঃ 'তারা যতটা স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন ও বলবান, ঠিক ততটাই মূর্খ। কথায় কথায় লাঠি ওঠানো, হত্যা করা, একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করা, ফসল কেটে নেওয়া, খামারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, কারুর বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করা এখানে প্রাত্যহিক ব্যাপার।'

যে নতুন গ্রাম-চেতনার কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তাতে এই পিছিয়ে থাকা মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামও সংযুক্ত। তৎকালীন হিন্দী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' এবং 'নাগার্জুন' উপন্যাসে এই তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপন্যাসের তৃতীয় স্তর,—যা মটরুর কাহিনীর মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে, তা' হলো আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ। স্বাধীনতার পরেও আমাদের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় এই শোষণ-তন্ত্র প্রায় যথাযথ সুরক্ষিত রয়েছে। উপন্যাসের অন্য মল্ল যোদ্ধারা ব্যক্তিগত মল্লযুদ্ধে একে অপরকে পরাজিত করে প্রশংসা পেতে ও গ্রামাঞ্চলে খ্যাতির

বিস্তার করতে সর্বদাই সচেষ্ট। মটরু পালোয়ান একমাত্র ব্যতিক্রম; সে মল্লযুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে একটি সামগ্রিক সংঘর্ষের সূত্রপাত করে, যা আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে একটি ছোটখাট বিদ্রোহের রূপ নেয়। মটরু সম্পূর্ণ উপন্যাসটির সূত্রধর, যে একদিকে প্রাচীন সামাজিক প্রথাকে ভাঙার চেষ্টা করে, অন্যদিকে আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে এগিয়ে যায়।

উপন্যাসটির রচনাশৈলী অত্যন্ত সহজ ও সরল। সংলাপে গ্রাম্য কথ্যভাষার প্রয়োগ রয়েছে। যে বিশেষ জনপদ ও অধিবাসীদের নিয়ে এই কাহিনী, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন রচনাশৈলী ও ভাষার প্রয়োগ উপন্যাসটির আপাত মাধুর্য ক্ষুণ্ণ করত, এবং উপন্যাসটি বর্ণসংকরতার শিকার হ'ত।

উপান্যাসটির আপাত সারল্যের গভীরে 'আইসবার্গে'র মতো বহু জটিলতা প্রচ্ছন্নভাবে স্থান করে নিয়েছে। অত্যন্ত জটিল বক্তব্যের এই সহজ-সরল উপস্থাপনা উপন্যাসটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমকালীন আর কোনো হিন্দী উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়না। লেখক অতি সরল একটি কাহিনীকে আধার করে তৎকালীন যুগের কয়েকটি প্রধান সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন। 'গঙ্গা মাইয়া' এই কারণেও উল্লেখযোগ্য।

অন্য বহু হিন্দী উপন্যাসের মতো 'গঙ্গা মাইয়া'তে বহু চরিত্রের সমাগম হয়নি। এখানে অল্প কয়েকটি চরিত্র রয়েছে। চরিত্রগুলির শিকড় স্বীয় জনপদের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত, সেখান থেকে তুলে নিয়ে তাদের অন্যত্র বপন করা সম্ভব নয়। শুধু সেই বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশ, মাটি, হাওয়ায় প্রাণ পেয়েছে তারা। 'গঙ্গা মাইয়া'র চরিত্রগুলি সম্বন্ধে এইকথা জেনে নিলে মানবচরিত্র সম্বন্ধে আরো অনেককিছু জানতে পারি আমরা। একটি সীমিত গণ্ডীর মধ্যে থেকেও এগুলি সার্বভৌম ব্যপ্তি পেয়েছে, এবং এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। সুবিখ্যাত ফরাসী প্রকাশন সংস্থা 'গাতিয়ার'—'গঙ্গা মাইয়া'র ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এবং ফ্রান্সে তা জনপ্রিয় হয়েছে—সেটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। স্বকীয়তার মধ্যেও সার্বভৌমতা নিহিত থাকে।

সমগ্র বিশ্ব আজ প্রকৃতি-বিরোধী অভিযানের পরিণাম দেখতে পাচ্ছে। পরিবেশ সমস্যার মহা সংকটকালে আমরা উপস্থিত হয়েছি। গঙ্গা অতীত ও বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত এক স্রোত, প্রকৃতি ও মানুষকে যা অবিচ্ছিন্ন রাখে। আজকের দিনেও কোনো কোনো মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করে। 'গঙ্গামাইয়া' পাঠ কালে এই সব কটি তথ্য মনে রাখতে হবে।

—বিজয় মোহন সিংহ

এক

সেদিন সকালে গোপীচন্দ্রের বিধবা বৌদি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল। পাড়া-পড়শী সকলে পরামর্শ করে ঠিক করল যে ব্যাপারটা একেবারে চেপে যেতে হবে। কাক পক্ষীতেও যেন কিছু টের না পায়। সেই রকমই ইচ্ছে ছিল তাদের। তবু কোথা থেকে যে কী হল, ঐ অঞ্চলের দারোগা গোপীচন্দ্রের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। রাগে তাঁর নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, চোখে অগ্নি দৃষ্টি, সঙ্গে একজন পুলিশ ও একটি চৌকিদার। সিঁধ কাটতে গিয়ে ধরা পড়ে চোরের যা দশা হয়, লোকগুলোর অবস্থা তখন প্রায় সেইরকমই। জটলার দিকে দারোগা তীব্র দৃষ্টিতে দেখলেন, ক্রুদ্ধ হয়ে মাটিতে পা ঠুকলেন, পুলিশটির দিকে তাকিয়ে গর্জন করে বললেন, 'সব কটাকে হাতকড়া লাগা।' তারপর ঘুরে চৌকিদারকে হুকুম দিলেন, 'গাঁয়ের মোড়লকে খবর দে।' আরো একবার সকলের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে একটা খাটিয়ার উপর ধপাস করে বসে পড়লেন। তাঁর সাপের মতো গোঁফজোড়া কেঁপে উঠল। সবাই মাথা নীচু করে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। কারুর গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরোলো না। বেরোবেই বা কী করে? পুলিশ তখন একে একে সকলের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দারোগার সামনে মাটির উপরেই বসিয়ে দিয়েছে।

চারপাশের আরো অনেক লোকের ভীড় জমে গেল সেখানে। গোপীচন্দ্রের বুড়ি মা এতক্ষণ বেশ চুপচাপ ছিলেন, এখন হঠাৎ দরজার সামনে এসে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কে জানে কেন তাঁর অন্তরে হঠাৎ তাঁর বিধবা পুত্রবধূর জন্যে দরদ উথলে উঠল। গোপীচন্দ্রের বুড়ো বাপ পুরনো বেতো রুগী; চলাফেরা করতে না পারায় ঘরের এক কোণে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছিলেন। বাইরের হৈ হল্লা আর মেয়েদের কান্নাকাটি শুনে বিছানায় উঠে বসলেন। কেশে কেশে গলা খাঁকারি দিতে লাগলেন যাতে কেউ অন্তত এই পঙ্গুটাকে এসে জানিয়ে দিয়ে যায় যে বাইরে ঘটছেটা কী।

গোপীচন্দ্র গ্রামের এক মাতব্বর কৃষক। ভগবান তাকে বলিষ্ঠ শরীর দিয়েছেন। তিরিশ বছরের এই সমর্থ যুবক কারুর পরোয়া করেনা। তাই ভীড়ের মধ্যে কারুর সাহসই ছিল না যে তার বিরুদ্ধে একটা কিছু বলে। হাতকড়া পরা অবস্থায় মাথা নীচু করে তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে সকলেই অবাক। ভাবছিল, ও কিছু বলছে না কেন? ওর কী দোষ থাকতে পারে? রাজপুতদের এই গ্রামে এটা কোনো নতুন ঘটনা তো নয়। কত বিধবাই পতিতা হয়ে নিজেদের মুখে চুণকালি লেপেছে, কিংবা নিরুদ্দেশ

হয়েছে, অথবা কোনো কুয়ো বা পুকুরে নিজেদের নৈবিদ্য সাজিয়েছে। যাই হোক সে ছিল ঘরের বৌ। একটা সম্মান আছে তার। এভাবে নিখোঁজ হয়ে বংশের মুখে কালি ঢালল। হয়ত সেই লজ্জাতেই গোপীচন্দ্র এখন চুপ করে আছে। থাকাই উচিত, এমন মানী লোক!

সাধারণ গরীবদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া পুলিশের লোকেদের আদপে পছন্দ নয়। বড় জোর দু চারটে থাপ্পড়, কিছুটা বকা ঝকা বা খানিকটা গালিগালাজ করেই ছেড়ে দেয় তাদের। এসবে থাকা মানে বৃথাই সময় নষ্ট করা। হাতে তো আসবে না কিছুই, শুধু শুধু অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নেওয়ার দরকারটা কী? জেনেশুনে যে কোনো ছুতোয় শুধু গণ্যমান্য আর ধনী লোকেদের ব্যাপারেই নাক গলাতে আসে তারা। তা না হলে দারোগার কী মাথা খারাপ হয়েছিল যে গোপীচন্দ্রের ব্যাপারে তিনি এত উৎসাহ, দুশ্চিন্তা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিলেন?

মোড়ল এসে পৌঁছতেই দারোগা আতসবাজির মতো ফেটে পড়লেন। কত কী যে বললেন, কত ভাবে চোখ পাকালেন, কত ভঙ্গীতে তাল ঠুকলেন আর কত রকম শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখালেন তার আর কোনো হিসেব রইল না।

মোড়ল মুচকি হাসলেন। তারপর দারোগা যেটুকু কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছেন, সেটুকু সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিলেন। অপরাধী লোকগুলোকে অনেক গালমন্দ করে পরে নিজেই তাদের হয়ে ওকালতী শুরু করলেন। ওদের তরফ থেকে দারোগার কাছে মাপ চাইলেন ও তাঁকে 'খুশী করে দেওয়ার' প্রস্তাবও রাখলেন। তারপর বললেন, 'দারোগাজী গোপীচন্দ্রের একবার জেল খেটে এসেও শিক্ষা হলো না, ও আবার জেলে যাবে। আমরা আর ওকে কতদিন বাঁচাবো বলুন তো? ও বুঝতে পারছে না যে একবার বদনাম হয়ে গেলে পরে আর সাক্ষী সবুদেরও দরকার হয় না।' এরপর অন্য লোকগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'গোপীচন্দ্রের সঙ্গে এই সবকটার শ্রীঘরে বেড়িয়ে আসার শখ হয়েছে।'

ইতিমধ্যে দারোগাও তাঁর পাশায় একটা নতুন দান ফেলার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টায় ছিলেন। মোড়ল চুপ করতেই তিনি গর্জে উঠলেন, 'না মশাই না। যদি হেঁজিপেঁজি ঘটনা হত, তাহলে কোনো কথাই ছিল না, কিন্তু এটা একটা গুরুতর ব্যাপার। আমাকেও তো কারুর কাছে জবাবদিহি করতে হয়।' এই বলে তিনি গোঁজ হয়ে বসে পড়লেন। মোড়ল ব্যাপারটা বুঝলেন। 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।' দারোগার হাত ধরে উনি তাঁকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন। মিনিট দশেক পরে তাঁরা ফিরলেন। দারোগা পকেট থেকে নোটবুক ও পেন্সিল বার করে বললেন, 'গোপীচন্দ্র, এখন বল, ঘটনাটা কী হয়েছিল।' তারপর ভীড়ের দিকে তাকিয়ে পুলিশকে ইংগিত করলেন। ভীড় সরিয়ে দেওয়া হল। গোপীচন্দ্রকে কিছুই বলতে হ'লনা,—দারোগা নিজেই সব লিখে ফেললেন। নিখোঁজ বিধবার একহাতে দড়ি

ও অন্যহাতে কলসি দিয়ে তাকে কূয়ার কাছে পাঠানো হল, তারপর কূয়ার পাশে জমে থাকা শ্যাওলায় পা পিছলে তাকে কূয়াতে ফেলে মেরে ফেলা হল। এদিকে গোপীচন্দ্রের টাকার থলি মুখ খুলল, আর ওদিকে আইনের মুখ বন্ধ হল।

গ্রামে নানান কথা চালু হল। তারপর মৃতা মহিলার নানান গুণের কতা স্মরণ করে, বিরুদ্ধ সমালোচনায় তাঁর আত্মাকে বৃথা কষ্ট দেওয়া অনুচিত কাজ হবে মনে করে, সকলেই নিজেদের মুখ বন্ধ করে নিল। ঘটনার শুরু ও শেষ হল। কিন্তু—

দুই

গোপীচন্দ্ররা দুই ভাই। বড়ভাই মাণিকচন্দ্র। দুজনের বয়সের তফাৎ বড়জোর দু'বছর। তাদের বাপ দুটি বলদ দিয়ে জমি চাষ করান। বাড়িতে মোষ রয়েছে। মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র মোষের দুধ খায় ও আখড়ায় কসরত করে। বাপ তাদের ধর্মের ষাঁড়ের মতো স্বাধীন ও দায়হীন ভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হেসে খেলে কাটানোর এই তো সময়। এরপর সংসারের জোয়াল কাঁধে পড়লে কে আর শরীরচর্চা করার সুযোগ পাবে? এই সময়ের প্রস্তুত শরীর সারাজীবন কাজে লাগবে। উঠতি বয়সের এই অবাধ স্বাধীনতা, দায়হীন জীবন, দুধ ও আখড়ার শরীরচর্চা,—এইসব মিলিয়ে তাদের দেহ সুগঠিত হল। দুই ভাই মিলে যখন আখড়ায় ছুটত, তখন তাদের তামাশা দেখতে সেখানে লোকের ভীড় জমত আর তারা অক্লান্তভাবে বাহবা দিত তাদের। নিজেদের সুডৌল, সুন্দর শরীরে ধূলো-মাটি মেখে যখন তারা আখড়া থেকে ফিরত, তখন রামলক্ষণের এই জুটিকে দেখে মা-বাপের বুক ভরে উঠত, মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হত, আর তাদের চোখ গর্বে উদ্দীপ্ত হ'ত। মা তাদের নজর তাড়াতেন, বাপ না জানি কত যে আশীর্ব্বাদ জানাতেন মনে মনে।

'বাহবা' পাওয়া বেশ মধুর ব্যাপার, কিন্তু তার নেশা ধরে যাওয়াটাই খারাপ। মানুষকে অনেক সময় তা অন্ধ করে দেয়। দুই ভাই-এর সুগঠিত শরীর আর দৈহিক শক্তির খ্যাতি ক্রমশঃ যখন আশেপাশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাদের যেন নেশা ধরে গেল। খেলাচ্ছলে একদিন তারা শরীরচর্চা শুরু করেছিল, ক্রমশঃ সেটা তাদের সখ হয়ে উঠেছিল। তারপর শরীর গঠন আর দৈহিক শক্তি বাড়ানো তাদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল। মা-বাপ ও পাড়া-পড়শীর প্রশ্রয়ও ছিল,—মাণিক ও গোপীর জুটি গাঁয়ের নাম উজ্জ্বল করবে। মাণিক আর গোপীও গ্রামে তাদের কীর্তিস্থাপন করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। বাদাম বাটা হল, ছাগল কাটা হল, ঘিয়ে রান্না হালুয়ার সুবাস সকাল-সন্ধ্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাপ তাঁর রোজগারের

মোটা অংশ এদের জন্যে ব্যয় করতে লাগলেন। আরো একটি দুধেল মোষ খুঁটিতে বাঁধা পড়ল। ফলটা এই হল যে বয়সের তুলনায় দুগুণ বা তিনগুণ হয়ে উঠল তাদের শরীর ও দৈহিক ক্ষমতা। পঁচিশ ছুঁতে না ছুঁতেই তাদের শরীরে হল হাতির মতো বল। আখড়ায় কসরত করলে তাদের ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ দুই মত্ত ষাঁড়ের হুঙ্কারের মতো অনেক দূর থেকে শোনা যেত। পায়ের দাপাদাপিতে আখড়ার জমি ধসে যেত, আর যখন তারা উরুতে চাপড় মেরে তাল ঠুকত তখন মনে হত দুটি মেঘের ধাক্কায় এই প্রবল শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে। বিশাল দুটি পাহাড়ের মতো তারা দীর্ঘসময় ধরে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। আখড়ার জমি ধসিয়ে, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়ে বেরিয়ে আসত তারা। তাদের দু'তিনটি চেলা তখন তাদের হাতির মতন শরীরে অনেকক্ষণ ধরে মাটি ঘষে ঘষে ঘামে ভেজা শরীর শুকিয়ে দিত। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল, শরীর যেন আর তাদের বশে রইল না। প্রতি রোমকূপে তাদের অপার শক্তির আভা ফুটে বেরুচ্ছে, পুষ্ট শিরা-উপশিরায় সুস্থ রক্তের ধারা ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে, রক্তাক্ত মুখমণ্ডলে রক্তের ধারা চুঁইয়ে পড়ছে। সুউচ্চ মাথা; রক্তাক্ত চোখ; পাকানো গোঁফ; সুগঠিত ঘাড়; উন্নত, চওড়া, খোলা ময়দানের মতো বুক; সুডৌল বাহু; সুপুষ্ট উরু; সুগঠিত মাংসপেশী;—পুষ্ট শরীর ও তার অপার ক্ষমতার গর্বে নেশাগ্রস্ত মত্ত হাতির মতো হেলেদুলে তারা যখন চলত, তখন মনে হত যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। দিক-দিগন্ত প্রণতি জানাচ্ছে তাদের উদ্দেশে। অপার ক্ষমতা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠছে তাদের চোখে। ছেলেদের এহেন উন্নতিতে মা-বাপের গর্ব ও আনন্দের সীমা রইল না। গ্রামবাসীরাও উজ্জ্বল চোখে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, এইবার সময় উপস্থিত।' এই সময়ের জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছে তারা। এখন দেখা যাক কার ঘাড়ে কটা মাথা,—এই দুই ভাইয়ের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক দেখি।

বাপের কাছে অনুমতি চাওয়া হল। তিনি বললেন, 'আরে ওরা তো এখন নেহাৎ শিশু।' তাঁকে বোঝানো হল ছেলেরা বুড়ো হয়ে গেলেও বাপের কাছে শিশুই থেকে যায়। যৌবন কালই যে কোনো কাজ করার প্রকৃত সময়। ওদের খ্যাতি গ্রাম-গঞ্জের সীমা ছাড়িয়ে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার এই তো সময়। আপনি যদি দুর্বল হয়ে পড়েন ওরাও নিজেদের উপর আস্থা হারাবে। আপনি খুশী হয়ে আজ্ঞা দিলে ওরা বংশের নাম উজ্জ্বল করবে, সেইসঙ্গে গ্রামেরও। বাপের যে নিজের ছেলেদের দৈহিক ক্ষমতা বিষয়ে সঠিক ধারণা ছিল না তা নয়; ছেলেদের নাম-যশ হোক এটাও তিনি চাইতেন, কিন্তু সেইসঙ্গে পিতৃ-হৃদয়ের গভীর মায়া ও মমতা হেতু সর্বদাই ভয় পেতেন। সকলের কথা শুনে তিনি উদাসীন ভাবে হাসলেন, যেন নিজের নাম ও সম্মানের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নন। নাম, মান, যশ, ঐশ্বর্য,—কেই বা না চায়, কিন্তু কেউই সেই চাওয়ার কথা অপরকে জানাতে চায়

না। যেন তাতে এই মহান বস্তুগুলোর মহিমা ক্ষুণ্ন হবে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই নিজেকে লোভী হিসেবে জাহির করে হাস্যাস্পদ হতে চায় না। বাপ বুঝদার লোক। মনের কথা চেপে রেখে নিস্পৃহভাবে বললেন, 'তোমরা যা ভাল বোঝো করো। আমি কোনো ব্যাপারেই বাধা দেব না। ছেলেদের উপর আমার যতটা অধিকার, গ্রামের সকলেরই ঠিক ততখানি। এই গাঁয়ের হাওয়া-মাটি জলেই তো ওদের শরীর তৈরি হয়েছে। তোমরা ওদের সঙ্গেই কথা বল। এতদিন ওরা স্বাধীন ছিল। এখনও যা খুশী করার স্বাধীনতা আছে ওদের।'

খুশীমনে সকলে পৌঁছল দুই ভাই-র কাছে। বাপের অনুমতির কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বল, তোমাদের মধ্যে কে আগে লড়বে।'

আখড়ায় দুই ভাই একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু আখড়ার বাইরে তাদের ভাব-ভালবাসা দেখে লোকে রাম লক্ষণের তুলনা দেয়। গোপী বলল, 'আমি থাকতে দাদা লড়বে কেন? বাবা আর দাদার আশীর্বাদের জোরে আমি নিশ্চয়ই জয়ী হব। ঈশ্বর আমাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন।'

মাণিক গোপীর চেয়ে বয়সে বড় হলেও দৈহিক ক্ষমতায় গোপীর চেয়ে অনেক পেছিয়ে। সে কথা গাঁয়ের আর সকলের মতো সে নিজেও জানত। গোপীই প্রথম লড়বে একথা জেনে সকলেই খুশী হল।

প্রথমতো ভালো দিন দেখে, কুস্তী লড়বার আমন্ত্রণ নিয়ে, পানের থালা হাতে লোক ছুটল নামকরা সব পালোয়ানদের কাছে। গোপীচাঁদ লড়াই-র জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল।

ঐ এলাকার সব পালোয়ানই মাণিক ও গোপীর নাম শুনেছে, এমনকী তাদের লড়াই স্বচক্ষে দেখেছে, কেউই ওদের সঙ্গে লড়তে সাহস করল না। কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে সকলেই লড়াই করতে অসম্মত হল। শেষকালে বৃদ্ধ পালোয়ান জোখুর আখড়ায় খবর পৌঁছল। কোনো পালোয়ানই এই দুই ভাই-র সঙ্গে লড়তে রাজী নয় জেনে জোখুর মহা বিস্ময়। এরা প্রায় সকলেই ছিল জোখুর সাগরেদ। এই বৃদ্ধ বয়সেও জোখুর সুনাম অক্ষুন্ন ছিল। কেউই তার কাছাকাছি ভিড়তে চাইত না। যৌবনের দিন ফুরিয়ে গেছে। জোখু বুড়ো হয়েছে। সে একথা জানত যে সারাজীবন ধরে অর্জন করা তার সুনাম সে গোপীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে মুহূর্তে হারাতে পারে। কিন্তু এছাড়া উপায়? গোপীর লোকেরা সব নামী দামী পালোয়ানের সামনে তার কীর্তি-ধ্বজা উড়িয়ে চলে এসেছে, জোখুর কাছ থেকেও যদি ওরা এইভাবে ফিরে যায় তাহলে লোকে কী ভাববে? বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের এই অপমান সহ্য হবেনা। লড়াই-র আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে সে তার পৌরুষ হারাতে পারে না। সে বুড়ো হয়েছে, শরীরে আগের সেই বল নেই,—তবু সে পুরুষ, প্রকৃত পুরুষ। লড়াই-র ডাকে সাড়া না দিয়ে আগেই হার মানতে রাজী নয়। 'জয় হনুমান'

বলে সে পানের থালা থেকে পানের খিলি নিয়ে মুখে দিল।

এই ঘটনার কথা শুনে সকলেই অবাক। কিন্তু সেই সঙ্গে বৃদ্ধ জোখুর পৌরুষ ও সাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। অল্পবয়সী সব কটা পালোয়ানের তো গলায় দড়ি দেওয়া উচিত! সব শুনে গোপীও যেন নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে গেল। বাপের বয়সী কারুর সঙ্গে সে লড়তে চায়নি। সমবয়সী কারো সঙ্গে লড়বার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু এখন সে নিরুপায়। একবার এগিয়ে এসে আর পিছিয়ে পড়া যায়না।

□

বিশেষ দিনে গাঁয়ের আখড়ার ফটক গাছের পাতা আর রংবেরঙের শিকলে সাজানো হল। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই কাছের ও দূরের গ্রামাঞ্চল থেকে আসা লোকের ভীড় জমে গেল। মা-বাপের আশীর্বাদ নিয়ে, ফুলের মালা গলায় পরে, বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে দুই ভাই আখড়ার দিকে এগিয়ে চলল। জনতা প্রত্যাশায় উন্মুখ। তারা বীর হনুমানের জয় জয়কারে আকাশ ফাটাচ্ছে। অনেক আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে গোপীচাঁদ এই দিনটির প্রতীক্ষা করেছিল। আজ তার মনে কোনো অনুভূতিই ছিল না। মনের কথা মনেই লুকিয়ে রেখে সে জনতার উৎসাহ ও আনন্দে সামিল হওয়ার চেষ্টা করছিল।

দুই দল দুই দিক থেকে একই সঙ্গে আখড়ায় পৌঁছল। দুই দলই জয়ধ্বনি করে উঠল। বাজনা আরো জোরে বেজে উঠল। সমস্ত পরিবেশে যেন বীর রসের সঞ্চার হল। সমবেত জনতার চোখে খুশী ও ঔৎসুকের চমক। গোপী ও জোখুর নিকট আত্মীয়েরা তাদের দুজনকে ঘিরে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, কখনও আবার লড়াই-র ব্যাপারে কোনো গূঢ় তথ্য জানিয়ে দিচ্ছিলেন। কোনো বয়স্ক পিঠ চাপড়ে সাবাসী দিচ্ছেন, কোনো সমবয়স্ক হাত মিলিয়ে বিজয়লাভের শুভকামনা জানাচ্ছে, অল্পবয়সী সাগরেদরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ঈশ্বরের কাছে তাদের সাফল্য কামনা করছিল।

আখড়ায় ঢোকার আগেই মাণিক গোপীর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি চুপি বলল, 'বুড়োটা চালাক, ওকে বেশী সুযোগ দিস না। হাত মেলানোর পরেই,—বুঝলি তো? তা' না হলে একবার ও যদি জমে যায়, কয়েক ঘণ্টার আগে নিস্তার নেই। যদি হেরেও যায় তবু লোকে বলবে এই বুড়োর সঙ্গে তো গোপীর লড়াই করাই উচিত হয়নি,—আর লড়লও তো কতক্ষণ ধরে টিকিয়ে টিকিয়ে। এইসব কথা বলার সুযোগ কাউকে দিস না, বুঝলি? ঝটপট সেরে নিস।'

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লাফ দিয়ে আখড়ার মাটিতে নামতেই দুপাশ থেকে সজোরে জয়ধ্বনি হল। বাজনা দ্রুত লয়ে বেজে উঠল। জনতার উৎসুক চোখ প্রত্যাশায় অস্থির।

দুই ওস্তাদ আখড়ার মাটি কপালে ছুঁইয়ে মনে মনে গুরুকে প্রণাম জানালো। তারপর একে অন্যের চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে পরস্পরের দিকে হাত বাড়াল। একে অন্যের হাতের আঙুল স্পর্শ করল,—আর সহসা বিদ্যুৎ চমকের মতো এক অঘটন ঘটে গেল। গোপী তার ডান পা তুলে জোখুর পেটে সজোরে লাথি মারল। বুড়ো চিৎকার করে যেন শূণ্যে উড়ে গেল, শূণ্য থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল আর পরক্ষণেই একটা বিশাল বড় পাথরের মতো জোখুর প্রাণহীন দেহটা আখড়ার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

জনতা স্তব্ধ। বাজনা থেমে গেছে। জোখুর দলের লোকেরা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল। ঝুঁকে দেখল জোখুর দেহ নিষ্প্রাণ, ঠাণ্ডা। কী হবে এবার? ওদের চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল, 'এ তো রীতিমতো অন্যায় নীতিবিরুদ্ধ কাজ। হাত মেলানোর আগেই জোখু ওস্তাদকে মেরে ফেলা হল। কুস্তীর সব নিয়ম এই কাপুরুষটা ভেঙেছে। আমরা একে আস্ত রাখব না।' ভীড়ের মধ্যে নানান চিৎকার শোনা গেল। গোপী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কী হল সে নিজেও বুঝতে পারছে না। বোঝার সময়ও নেই। জোখুর দলের লোকেরা লাঠি উঠিয়েছে। অন্য দলও চুপ করে নেই। খটাখট লাঠি চলতে লাগল। ভীড় ছত্রভঙ্গ হল। কারুর মাথা ফেটে রক্তের ধারা বইল। কেউ হাতে পায়ে চোট পেয়ে উল্টে পড়ল। জোখুর দল ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ায়, তারা নিজেরাই নিজেদের দলকে নিরস্ত করল। ঘটনাটা গোপীর গ্রামে ঘটেছে। জোখুর দল অন্য গ্রাম থেকে এসেছে। তারা নিজে থেকে থেমে না গেলে কাউকে আর বেঁচে ফিরতে হ'ত না। লড়াই থেমে গেল। 'কাছারিতে দেখা হবে'—এই হুমকি দিয়ে জোখুর দল ফিরে গেল।

এই ধরণের ঘটনা কাছারি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া খুব সম্মানের ব্যাপার হত না। এতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না, বরং ক্ষুণ্ণ হয়। জোখু পালোয়ানের এইভাবে মৃত্যু হওয়ায় অপবাদ কী কম হয়েছে যে আদালত পর্যন্ত সেটা টেনে নিয়ে যেতে হবে? এলাকার দারোগা গোপীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে এসেছিলেন, কিন্তু গোপীর দল তার পকেট গরম করতেই তিনি নিরস্ত হলেন।

ঘটনার ফলস্বরূপ জোখুর গ্রামের লোকেরা গোপী ও তার পরিবারের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এই অন্যায় তারা কিছুতেই ভুলতে পারল না। জোখুর মৃত্যু গোপীর মনেও গভীর রেখাপাত করল। সে জীবনের মতো কুস্তীর ময়দান থেকে সরে এল। মাণিক ও গ্রামের লোকেরা অনেক বুঝিয়েও তাকে ফেরাতে পারল না। গোপী ঘর-গেরস্থালির কাজে সবরকমে বাপকে সাহায্য করতে লাগল।

তিন

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। বাপ এবার ছেলেদের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এর আগেও কয়েক জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু 'এত তাড়ার কী আছে' বলে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এবার এত ভালো সম্বন্ধ এল যে খুশীর সীমা রইল না। দুই ছেলের জন্যে সীতা আর উর্মিলার মতো উচ্চ কুলের দুই মমতাময়ী, নম্রস্বভাবা, সহোদরা বোনের বিবাহের প্রস্তাব এল। সুযোগ্য পুত্রদের জন্যে সুযোগ্যা পুত্রবধূরা আসছে। বধূদের মুখ দেখবার জন্যে মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠল। এই সম্বন্ধের কথা যে শুনলো সেই বলল, 'আর চিন্তা নেই। ঈশ্বরের কৃপায় এত ভালো বৌ ঘরে আসছে। দুই ছেলের সব কিছু যেমন একসঙ্গে হয়েছে,—বিয়েটাও তেমনি একসঙ্গে দিয়ে দাও।'

ধূমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। সুশ্রী, সুশীলা দুটি বৌ একত্রে এসে ঘর আলো করল। মা-বাপের সুখের আর সীমা রইল না। মেয়ে দুটির বিষয়ে যা শুনেছিলেন, ওরা তার থেকে আরো বেশী ভালো একথা বুঝে তাঁরা পরম প্রসন্ন হলেন।

গোপী প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে একটি স্নেহশীলা বৌদিকে পেয়ে ভারী খুশী। সংসার এত মধুময়, এত আনন্দের হয়ে উঠল যে সে আর বাড়ি ছেড়ে বেরোতই চায় না। বাইরের জগতের সঙ্গে আর যেন কোনো সম্পর্কই রইল না। গোপীর মন এক কেন্দ্রিক। আগে শরীর চর্চা নিয়ে এত মগ্ন থাকত যে সাংসারিক কোনো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না। এখন একটা ছেড়ে অন্যদিকে এত বেশী আঁকড়ে ধরল যে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। লোকাচারের রীতি অনুসারে দিনের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ পেত না সে; অপর দিকে বৌদির ব্যাপারে তেমন কোনো নিষেধ না থাকায়, বৌদির সঙ্গে সে খোলাখুলি মিশত, হাসিঠাট্টা করত, উচ্চহাসিতে ঘর ভরিয়ে দিত। হাসি ও আনন্দের এই পরিবেশ মা-বাপের ভাল লাগত। এই হাসি তামাশায় অংশ গ্রহণের অধিকার মাণিকের ছিল না। গোপীর সঙ্গে তার বৌদির এই স্নেহময় সম্পর্ক সে মনে মনে উপভোগ করত। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা, বোনের প্রতি বোনের, দেওর-বৌদির মধুর সর্ম্পক, ছেলে-মা-বাপ-বৌ সকলের প্রতি সকলের প্রীতি,—সারাক্ষণ যেন বাড়িতে অমৃতের বর্ষা হচ্ছে, আর সেই অমৃত ধারায় স্নান করে প্রতিটা প্রাণী আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। কোনো দুঃখ নেই, কোনো অভাব নেই, কোনো চিন্তা নেই. কোনো ভয় নেই।

কত ভালো হত সংসারের এই উদ্যান যদি এইরকমই ফুলে ফুলে ভরে থাকত। প্রতিটি বৃক্ষ, প্রতিটি পুষ্প সর্বদাই আনন্দে হিল্লোলিত হত! কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন উদ্যান আছে যেখানে পত্র ও পুষ্পের আনন্দ পাতা ঝরার দিন এসে কেড়ে না নেয়?

হাসিখুশিতে মাস ছয়েকই কেটেছিল, হঠাৎ এক অন্ধকার রাত এসে এই আনন্দের সংসারটার এক কোণে আগুন লাগিয়ে দিল। সত্যনারায়ণ পুজোর জন্যে কিছু দরকারি জিনিসপত্র কিনতে মাণিক শহরে গিয়েছিল। ফেরার সময় বেশ রাত হয়েছিল। শহর থেকে ওদের গ্রামে আসতে হলে জোখুর গ্রামের পাশ দিয়ে আসতে হয়। জিনিসপত্রের পোঁটলা কাঁধে ঝুলিয়ে জোর কদমে হাঁটছিল মাণিক। জোখুর গ্রামের সীমায় একটা বাগানের কাছাকাছি আসতে তার মনে হল কারা যেন তার পিছু পিছু আসছে। পিছন ফিরে দেখতেই মাথায় প্রচণ্ড জোরে লাঠির বাড়ি পড়ল। তারপর চার দিক থেকে অবিরাম লাঠির ঘা পড়তে লাগল। মাণিক জ্ঞান হারাল। তার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মাথা ফেটে রক্তের ধারা বইল। এইসময় কেউ তার ঘাড়ের উপর লাঠি রেখে তাতে সজোরে চাপ দিল। মাণিকের নিঃশ্বাস বন্ধ হল, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল।

মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার আগেই কিছু লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে আততায়ীরা পালাল। লোকগুলো শহরে যাচ্ছিল, বাগানের রাস্তায় রক্তাক্ত লাশ দেখে তারা ভয় পেল। কিন্তু শহরের লোকের মতো, গ্রামের লোকেরা এই রকম অবস্থায় ভয় পেয়ে পালায় না। যা করণীয় কর্তব্য তা তারা পালন করে। ঝুঁকে দেখে মাণিককে চিনতে পারল তারা। এই দুই ভাইকে ঐ অঞ্চলের প্রায় সব লোকেই চেনে। জোখুর সঙ্গে গোপীর কুস্তী লড়ার কথা মনে পড়ল, সব ব্যাপারটা বুঝতে তাদের দেরী হল না। জোখুর গ্রামের লোকেদের হঠকারিতায় তারা ক্ষুব্ধ হল। একটি লোক মারফৎ গোপীকে খবর পাঠানো হল। নির্দেশ দেওয়া হল গোপী যেন নিজের দলবল সঙ্গে করে আনে, মাণিকের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

'বেচারা মাণিক। ওর বৌটা চিরকালের মতো একা হয়ে গেল। কাপুরুষগুলো তাদের পাপের শাস্তি নিশ্চয়ই পাবে। প্রতিশোধ নিতে হলে প্রকৃত পুরুষের মতো সামনা-সামনি নিতে পারত।' মাণিককে ঘিরে বসে লোকগুলো তাদের রাগ আর দুঃখের প্রকাশ করছিল।

গোপীর কাছে খবর পৌঁছল। মা আর বৌ বুক চাপড়ে আছাড় খেয়ে পড়ে, চিৎকার করে কেঁদে উঠল। গোপীকে যেন সাপে ছোবল মেরেছে। সে মাথায় হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আঘাত পেয়ে বাপ যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন। আকস্মিক বজ্রপাতে মস্তিষ্ক শূণ্য হয়ে গেছে।

সমস্ত গ্রামে তড়িৎ গতিতে এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে কোলাহল শুরু হল। রাগে, দুঃখে পাগল হয়ে, লাঠি হাতে সারা গ্রাম একত্রিত হল গোপীর দরজার সামনে। মেয়েরা তার মাকে ও বৌ-দুটিকে সামলাচ্ছিল। বয়স্করা বাপকে। আর যুবকেরা? তারা চারদিক থেকে গোপীকে ঘিরে তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে ডাক দিচ্ছিল।

ধ্যান-জ্ঞান হারিয়ে গোপী চুপচাপ বসে ছিল। সহসা তার চোখ বিস্ফারিত হল। সে হঠাৎ উঠে ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা উঠিয়ে নিয়ে আহত বাঘের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। গ্রামের যুবক লাঠিয়ালেরা বুকে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে তার পেছনে পেছনে ছুটল। খবর পেয়ে চৌকিদার থানার দিকে দৌড়ল।

এই ঘটনার খবর জোখুর গ্রামে পৌঁছয়নি। ব্যাপারটা জোখুর কয়েকজন সাগরেদের ষড়যন্ত্র ছিল। তারা নিজেদের কাজ শেষ করে গা ঢাকা দিয়েছে। ক্রমশঃ এগিয়ে আসা হৈ-হট্টগোল শুনে তারা ভাবল কোনো ডাকাতের দল লুটপাট করতে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। সমস্ত গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামের যুবকেরা লাঠি উঠিয়ে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হল। যেদিক দিয়ে কোলাহল এগিয়ে আসছে, তারা সদলবলে সেদিকেই ছুটল। মেয়েরা ও বয়স্করা ভয়ার্ত, শিশুরা কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

গোপীর দল গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে সমবেত জনতার হাতে উদ্যত লাঠি দেখে বুঝে গেল যে এরা আগে থেকেই তৈরি। অবশ্য বোঝা না বোঝার মতো মনের অবস্থা কোনো দলেরই ছিল না। ক্ষুধার্ত বাঘের মতো একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবিরাম লাঠি চলতে লাগল। অন্ধকারে যেন একশো বিদ্যুতের চমক। অন্ধের মতো লাঠি চালাচ্ছে তারা। কার দলের কে আহত হল, কার লাঠি কার মাথায় পড়ল এসব বোঝবার মতো হুঁশ নেই কারুর।

একদলের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে, অন্যদলের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ। কে হার মানবে কার কাছে? দেখতে দেখতে রক্তের ফোয়ারা ছুটল, প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অনেকে। এসব দেখার অবকাশ কোথায়? প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলা চলেছে এখন।

মাণিকের দেহ থানায় নিয়ে আসার হুকুম দিয়ে দারোগা দশটি সশস্ত্র কনস্টেবল ও চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল। লাঠির শব্দ পেয়ে টর্চ জ্বেলে তিনি ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখতে পেলেন। রিভলবার বার করলেন। কনস্টেবলদেরও শূণ্যে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। গুলির শব্দ শুনে সকলেই বুঝল পুলিশ এসে গেছে। লাঠি থামিয়ে এবার পালানোর তাড়া পড়ে গেল। কিন্তু তার আগেই বন্দুকধারী পুলিশ বাহিনী ঘিরে ধরেছে তাদের। টর্চের তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, দেখতে দেখতে সকলের হাতে হাতকড়া পড়ল।

□

গোপীর বাঁ হাতের তিনটে আঙুল থেঁতলে গেছে। গলার কাছাকাছি ডান দিকের পাঁজরে জোরে আঘাত লেগেছে। কিন্তু রাগে, দুঃখে সে এত বেশী আচ্ছন্ন ছিল যে পরের দিন সকালে পরগণার হাসপাতালে যখন চোখ মেলল তখন তার বোধ ছিল না

যে সে কোথায় আছে; তার হাতে, গলায়, বুকে কেন পট্টি বাঁধা; কেন তার সর্বশরীরে এত ব্যথা; মাথায় কেন এত যন্ত্রণা হচ্ছে। গোপীর নিজের ও জোখুর গ্রামের অনেকগুলি লোক আহত হয়ে আশে পাশে পড়েছিল। একে অন্যের দিকে বিস্ফারিত ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে, কারুর কিছু বলার বা শোনার ক্ষমতা নেই আর। ওরা নিজেরাই নিজেদের, একে অন্যের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ।

□

মাণিক নেই। আহত গোপী গ্রেপ্তার হয়ে আদালতের রায়ের অপেক্ষা করছে। মা-বাপ ও বৌ দুটির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। অসহায় যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়া ছাড়া তাদের উপায় ছিল না।

গ্রামের অনেকগুলি বাড়িতেই শোকের স্তব্ধতা, দুঃখের অন্ধকার নেমে এসেছে। গোপীর সংসারের বিষাদ যেন সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। তার বাড়িতে সারাক্ষণ গাঁয়ের লোকের ভীড়। তারা গোপীর মা-বাপকে বোঝানোর চেষ্টা করে, সান্ত্বনা দেয়, কখনো আবার নিজেরাই কান্নাকাটি জুড়ে দেয়।

মামলায় উকিল নিয়োগের তোড়জোড় শুরু হল। সকলেই নিজেদের সঞ্চিত অর্থ দিতে প্রস্তুত। গ্রামের সকলের মামলা, অনেকগুলি যুবকের জীবন এর সঙ্গে জড়িত। সবচেয়ে বড় কথা গোপীর জীবন বাঁচাতে হবে,—সে গ্রামের সকলের নয়নের মণি, মা-বাপের একমাত্র ভরসা, দুঃখিনী স্ত্রী ও অভাগী বৌদির জীবনের একমাত্র আশা। বৌ দুটির বাপ ও বড় ভাই এই বিপত্তির খবর শুনে এসে পৌঁছেছেন। এই দুঃখের তাঁরাও ভাগীদার। গোপীর জীবন বাঁচাতে তাঁরাও সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

টাকার অনেক বড় অঙ্কও এবার আইনের মুখ বন্ধ করতে পারল না। পাঁচজন মারা গিয়েছে। এক-আধজন হলেও দারোগা চেষ্টা করে দেখতেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। জিলার বড় অফিসার হয়ত কিছু করতে পারতেন, কিন্তু গ্রামবাসীর সাধ্য নেই যে তার কাছে পৌঁছয়। আহত লোকগুলো সুস্থ হয়ে হাজতে পড়ে রইল। মামলার শুনানি আরম্ভ হল। ফৌজদারীর সবচেয়ে বড় উকিল নিযুক্ত হয়েছিল। তাঁর অনেক চেষ্টাতেও কারুর জামিন মঞ্জুর হল না।

বাপ একবার গোপীর সঙ্গে দেখা করে এলেন। দুজনেই নিজেকে শক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল,—কোনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। বাপ ছেলেকে সান্ত্বনা দিলেন। ছেলে বাপকে চিন্তা করতে নিষেধ করল। আর বিশেষ কোনো কথা হল না। বিদায় নেবার সময় গোপী বলল, 'বৌদিকে দেখো।' ঐ একটি কথায় যে কত দুঃখ, কত ব্যথা, কত অপমান লুকিয়ে ছিল বাপ তা' অনুমান করতে পারলেন। মন শক্ত করে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। গোপী চোখের জল মুছল,

জেলের ফটকের সামনে এসে বাপও চোখের জল সামলে নিলেন।

অবশেষে মামলার রায় জানা গেল। সকলেরই সাজা হয়েছে. কারুর কুড়ি বছর, কারুর চার আর কারুর পাঁচ বছরের জেল হয়েছে। গোপীর শাস্তির মেয়াদ পাঁচবছর। তার বাড়িতে আবার শোকের ছায়া নামল। মা-বাপের দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, বড় বৌ-এর অবস্থা তো অসহায় হয়েই ছিল, এবার ছোট বৌ-এর হৃদয়েও এক তীক্ষ্ণ শলাকা বিদ্ধ হল।

চার

বাপ এবার সত্যিই বুড়ো হয়ে গেলেন। দুই ছেলেকে হারিয়ে তিনি যেন দুটি হাত খুইয়েছেন। মনের সব আনন্দ দুঃখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোনো উৎসাহ, কোনো আশা আর বাকী নেই তাঁর জীবনে। বৌ দুটিকে দেখে অষ্টপ্রহর তাঁর মনে এক রুদ্ধ হাহাকার। কাজকর্ম, স্নান-খাওয়া কিছুই ভালো লাগে না। বৌ দুটির ভাই এসে চাষবাস ও ঘরসংসারের দেখাশোনা করে যায়।

মায়েরও করুণ অবস্থা। তিনি সারাক্ষণ ছেলে দুটির কথা স্মরণ করে বিলাপ করেন ও অশ্রুপাত করেন। ছোট বৌ-র মনে যে শলাকা বিঁধেছিল তা চিরকালের মতো তার মনের শান্তি কেড়ে নিল। সে বড়ই কোমল ও ভাবুক প্রকৃতির মেয়ে। সংসারের কোনোরকম দুশ্চিন্তা বা দুঃখের অভিজ্ঞতা হয়নি তার। হঠাৎ বিপদের এই পাহাড় ভেঙে পড়ায় তার অন্তরাত্মা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে শয্যাশায়ী হল। অন্নজল ত্যাগ করল। দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। শ্বশুর-শাশুড়ি নিজেদের দুঃখ ভুলে তাকে বোঝায়, ভাই এবং অন্যান্য মহিলারা নিজেকে শক্ত রাখার উপদেশ দেয়—কিন্তু সে যেন কিছুই শুনতে পায় না।

একদিন রাত্রে কলুপাড়া থেকে ফেরার সময় বাপের ঠাণ্ডা লাগল। পরদিন তিনি জ্বর গায়ে শয্যা নিলেন। এমন জ্বর যে কয়েক সপ্তাহ শুয়ে থাকতে হল। সেইসঙ্গে কাশি। যতদূর সম্ভব চিকিৎসা হল। বাড়ির এমন অবস্থায় সেবা শুশ্রূষা করার মতো কেউ ছিল না। ছোট বৌ শয্যাশায়ী, বড়বৌ শোকে কাতর। একলা বুড়ি কতদিক সামলাবে? বুড়ো কিছুটা ভালো হয়ে উঠলেও তাঁর দুই হাঁটু বাতে আক্রান্ত হল। প্রথম দিকে লাঠি নিয়ে অল্প চলাফেরা করতে পারতেন। ক্রমশঃ আর সেই ক্ষমতাও রইল না,—ঘরের এক কোণে খাটিয়াতে পড়ে থাকতেন।

ঘরসংসারের অবস্থা দেখে গ্রামের লোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত 'হায়রে, কী ছিল আর কী হয়েছে।'

অবশেষে একদিন বড় বৌ বুঝতে পারল যে সংসারটা এইভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার আছেই বা কী? জীবনটা তো নষ্ট হয়ে গেছেই, সেইসঙ্গে এই সংসারটাও যদি ছারখার হয়ে যায় তবে সেটা বড় দুঃখের হবে। না না এমনটা সে কখনোই হতে দেবে না। সে বাড়ির বড় বৌ। এই দায়িত্ব তাকে নিতেই হবে। সবাই যদি নিজের দুঃখে কাতর হয়, তাহলে কী করে চলবে? এখন তার জীবনের উদ্দেশ্য শুধু শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর আর বোনের দেখাশোনা করা। সে অভাগিনী, তাই সংসারের আজ এই অবস্থা। বাড়ির সকলের চরম দুরাবস্থার জন্যে দায়ী তার দুর্ভাগ্য। দুঃখ আঁকড়ে পড়ে থেকে নিজের দায়িত্ব সে অস্বীকার করতে পারে না। মন শক্ত করে সংসারের সেবায় সে জীবন উৎসর্গ করবে। দুঃখের এই দীর্ঘ নদীর ওপারে একদিন তো পৌঁছতেই হবে।

সেইদিন থেকে সে যেন এক করুণাময়ী দেবীতে রূপান্তরিত হল। কয়েকটি শোকার্ত দুঃখী হৃদয়কে সেবা, শুশ্রূষা, স্নেহ ও ভক্তির শীতল ছায়ায় ঘিরে নিল। স্নান সেরে অনেক ভোরে সে পূজো করত। তার শ্বশুর, শাশুড়ি ও বোনের সেবায় মন দিত।

তার শূণ্য সিঁথি, খালি হাত, সাদা শাড়িতে জড়ানো দীন হীন রূপ দেখে শ্বশুরের অন্তর হাহাকার করে উঠত। তিনি কিছু বলতে পারতেন না। সে তাঁকে ধরে খাটে বসাত, হাত-মুখ ধুইয়ে দিত, সামনে বসে থেকে খাওয়াত। শ্বশুর যন্ত্রের মতো সব কিছু করে যেতেন, গভীর বেদনায় তাঁর বুক ভেঙে যেত। যতক্ষণ বড় বৌ সামনে থাকত তিনি তার করুণ মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন।

বড় বৌ আবার ঘর-সংসারের কাজে মন দিয়েছে দেখে শাশুড়ির ভাল লাগত। এইভাবে তবু নিজের দুঃখ কিছুটা ভুলে থাকতে পারবে।

সে যেন তার ছোট বোনের মা হয়ে উঠল। ছোট বোনকে সে বরাবরই খুব ভালোবাসে। কিন্তু এখন তার স্নেহ, মমতা, সেবা আর ত্যাগের প্রয়োজন ছিল। দিদি তাকে সবকিছু উজাড় করে দিল। ছোটবোনকে সে শিশুর মতো কোলে করে ওষুধ খাওয়ায়, খাবার খাওয়ায়, জামা কাপড় পরায়, চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে দেয়। তারপর সিঁদূর কৌটো এনে বলে, 'নে, এবার সিঁদূর পরে নে।' ছোটবোন শূন্য চোখে দিদির খালি সিঁথির দিকে তাকায়। বুকে এক অসহ্য ব্যথা অনুভব করে, অশ্রু সজল চোখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে বলে, 'এসব রেখে দে দিদি।' দিদি তাকে কাছে টেনে আদর করে বলে, 'এমন কথা বলিস না বোন। আমার সিঁথির সিঁদূর ঘুচে গেছে। তোর সিঁদূর অক্ষয় হোক। তাই দেখে দেখেই আমি আমার জীবনটা কাটিয়ে দেবো। নে, সিঁদূর পরে নে।'

ছোটবোন দিদির কোলে মাথা রেখে কেঁদে ফেলে। দিদির চোখেও জল আসে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'এমন করে না, পাগলি মেয়ে।' দিদি

নিজের আঁচলে ছোট বোনের চোখ মুছিয়ে দেয়, বলে, 'নে এবার সিঁদূর পরে নে, লক্ষ্মী মেয়ে।' ছোটবোন দুচোখ ভরা জল নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে সিঁদূর কৌটো খুলে সিঁদূর তুলে নেয়। দিদি তখন এক অবুঝ ব্যথা বুকে নিয়ে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়।

□

গোপীর বৌদির তার স্বামীর কথা বড় বেশী মনে পড়ে। প্রতি মুহূর্তে তার অশ্রুসজল চোখের সামনে তার স্বামীর নানান ছবি ঝলমলিয়ে ওঠে। পূজো করতে বসে প্রতিদিন সে প্রার্থনা করে, 'হে ভগবান, আমাকেও তাঁর চরণে স্থান দাও।'

কখনো কখনো নিজের দেওরের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ও খুশীতে উচ্ছল দিনগুলিও তার মনে পড়ে। তখন মনে হয় সব যেন এক স্বপ্ন ছিল। হায়রে, কে জানত এই হাসিখুশীতে ভরা দিনগুলো চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবে আর তার স্মৃতি শুধু গানের সুরের মতো মনের মধ্যে গুঞ্জন করে বেড়াবে। মনে পড়ে যায় তার দেওর ভাইয়ের হত্যার শোকে পাগল হয়ে নিজের সর্বসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছে। সেই মুহূর্তে অজান্তেই তার দৃষ্টি ছোটবোনের দিকে চলে যায়, যার আঁচলে তার দেওরের জীবনের সব সুখ-দুঃখ বাঁধা পড়ে আছে। সে দেখতে পায় তার এত সেবাযত্ন সত্ত্বেও ছোটবোন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেক বোঝালেও সে কিছুই বুঝতে চায় না। দেওর এসে তার স্ত্রীকে এই অবস্থায় দেখলে, কী দশা হবে তার?

দুঃখ সহ্য করে করে ক্রমশঃ সে বেশ শক্ত হয়ে গেল। আরো মন দিয়ে বোনের সেবা করতে লাগল। সে যেন শুধু তার বোন নয়,—তার দেওরের গচ্ছিত এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদকে রক্ষা করাই তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

কিন্তু এত সেবাযত্ন সত্ত্বেও তার বোনের স্বাস্থের কোনো পরিবর্তন হল না। তার মন মাঝে মাঝেই এক ভয়ানক আশংকায় কেঁপে ওঠে। ঠাকুরের মূর্তির সামনে বসে সে প্রার্থনা করে, 'হে ভগবান, এই হতভাগা সংসারটাকে একটু দয়া কর। এখনও যদি তৃপ্ত না হয়ে থাকো তো আমাকে উঠিয়ে নাও। তোমার ক্রোধ সংযত কর।'

কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি থেকে ঐ সংসার বঞ্চিতই থেকে গেল। ছোটবোনের অবস্থার কোনো উন্নতিই হল না। ক্রমশঃ তার স্বাস্থ্যের এত অবনতি হল যে একদিন তার ভাই এসে তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে গেল। সকলেই মনে করেছে যে ভিন্ন পরিবেশে, মা-বৌদি আর সমবয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে সময় কাটালে সে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। ভাই বড় বোনকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে চলে গেলে এই সংসার কেমন করে চলবে এ কথা ভেবেই আর তার যাওয়া হল না। পালকিতে উঠে বসার আগে ছোটবোন অনেক কাঁদল। শাশুড়ি ও দিদিকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরল যেন সে

তাদের কাছে শেষ বিদায় নিচ্ছে। শ্বশুরের পা বৌ-এর চোখের জলে ভিজে গেল। বুড়ো শ্বশুর দুই হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন।

কে জানত যে সত্যিই সেটা ছিল শেষ বিদায়। মা-বাপ-দাদা-বৌদিরা কোনো কিছুর অভাব রাখেন নি। জলের মতো অর্থ ব্যয় করেছেন তাঁরা। কিন্তু অদৃষ্টে যা ছিল তাই হল। যে শলাকা একদিন তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছিল, অবশেষে তার প্রাণ হরণ করে পরিত্রাণ দিল।

খবর পেয়ে শ্বশুর, শাশুড়ি ও বড়বোনের যা অবস্থা হল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাদের ভগ্ন হৃদয়ে আরো একটি সুতীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ হলো।

পাঁচ

গোপীর হাজতবাসের প্রথমদিকে তার বাপ প্রতি মাসে একবার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তাঁর হাঁটাচলা বন্ধ হবার পর গোপীর শ্বশুর ও শালা নিয়মিত তার সঙ্গে দেখা করতেন। গোপী প্রতিবারই মা-বাপ ও বৌদির খবর জিজ্ঞেস করত, ঘর-সংসারের কথা জিজ্ঞেস করত। তাঁরা যা হোক কিছু উত্তর দিতেন। লজ্জাবশতঃ গোপী কখনোই নিজের স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করত না। তাঁরাও তাকে কিছু জানায়নি। হাজতবাসের কষ্টের মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যুর শোক তাকে দিতে চাননি তাঁরা।

জেলে থাকতে সকলের কথাই মনে পড়ত গোপীর। কিন্তু বৌদিকে নিয়ে তার সবচেয়ে বেশী চিন্তা ছিল। বৌদিকে সর্বদা সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেত। যে স্নেহময়ী বৌদিকে পেয়ে, যার হৃদয়ের স্নেহ আকণ্ঠ পান করে সে একদিন তৃপ্ত হয়েছিল, সেই বৌদিকে বিধবার বেশে কেমন করে দেখবে সে? সেই শূন্য সিঁথি, খালি হাত, শীর্ণ মুখশ্রী...

□

কারাগারের পরিশ্রমে গোপী কখনো ফাঁকি দেয় না। তার মজবুত শরীর, কঠোর পরিশ্রমে ভয় কিসের? বাড়ির মতো খাওয়া-দাওয়া আর নিরুদ্বেগ জীবন হলে জেলেও তার স্বাস্থ্য অটুট থাকত। কিন্তু ঘি দুধ খাওয়া শরীরের জন্যে বরাদ্দ শুধু শুকনো রুটি আর কাঁকর মেশানো ডাল। তার উপর সারাক্ষণ বৌদির চিন্তা মাথায় ঘুরছে। গোপী দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। তবু তার কুস্তীগীর পালোয়ানের শরীর। মরা হাতিও লাখ টাকা। কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। গোপী কারুর

সঙ্গে মেলামেশা করে না, নিজের দুঃখ নিয়ে সর্বদা একলাই থাকে। এত বড় জেলখানায় সে একাকীত্বের বেড়াজালে নিজেকে আটকে রেখেছে।

মোকদ্দমা চলাকালীন সে জিলা হাসপাতালে পড়ে ছিল। পাঁজরের আঘাত মারাত্মক ছিল। ব্যথার উপশম হত না। ছোট হাসপাতালে এক্স-রের ব্যবস্থাও ছিল না। কে আর ওসব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেয়? যেমন তেমন চিকিৎসা চলতে লাগল আর মোকদ্দমাও চলতে থাকল। তারপর একদিন তাকে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সাজা পাবার পর গোপীকে যখন বেনারস জেলে পাঠানো হল, তখন পর্যন্ত তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। শক্ত-সমর্থ শরীর থাকায় সে সব কিছুই সহ্য করে নিচ্ছিল।

বেনারস জেলের হাসপাতালে সৌভাগ্যক্রমে একজন ভালো কম্পাউণ্ডারের দেখা পাওয়া গেল। সে তারই গ্রামের লোক। জেলের হাসপাতালে সবরকম ওষুধও থাকে না। কম্পাউণ্ডারের সেবাযত্ন ও গোপীর রক্তের জোরে ক্রমশঃ ব্যথার উপশম হতে লাগল। ওখানেই মটরু সিং-এর সঙ্গে পরিচয় হল। ঘাঘরা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের নাম করা মল্লবীর সে। জাতি ও বৃত্তি এক হওয়ায় দুজনেই দুজনকে জানত। গোপীর গ্রাম নদীর তীর থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে। মটরু ঘাঘরা নদীর ধারে একটি ঝুপড়িতে ছেলেদের নিয়ে থাকত। ঐ অঞ্চলের এক প্রচলিত কিংবদন্তী হল মটরুর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও সামর্থ দেখে ঈর্ষাবশতঃ কোনো কুস্তীগীর তাকে পানের সঙ্গে মিশিয়ে এমন কিছু খাইয়েছিল, যাতে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ক্রমে সে হাঁপানীতে ভুগতে থাকে। অনেক চিকিৎসা করেও কোনো ফল হয় না। অগত্যা হতাশ হয়ে কুস্তীর আখড়া ছেড়ে সাধারণ কৃষকের জীবন বেছে নেয় সে। বিবাহ করে, আর তার তিনটি ছেলেও হয়।

নিজের এলাকায় মটরু রাজসম্মান পেত। নদীর ধারে যেন তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। ঘাঘরার ধারার সঙ্গে তার 'রাজমহল' ভাঙত আর গড়ত। বর্ষার সময় ঘাঘরার জল বেড়ে উপরে উঠে আসত, মটরুর ঝুপড়িও উপরে উঠত। ভাদ্র মাসে ঘাঘরা নদী ফুলে ফেঁপে যখন সমুদ্রের রূপ নিত, মটরু তখন কোনো গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিত। জল যেমন যেমন নীচে নামত, মটরুর ঝুপড়িও নামতে থাকত,— কার্তিক মাস নাগাদ আবার সেই পুরোনো জায়গায় ফিরে আসত। মটরু কখনোই 'গঙ্গা-মা'র আঁচল ছাড়ত না। সে যেন মায়ের কোলের ছেলে।

নদীর জল সরে যাওয়ার পর বালির চরায় বনঝাউ আর নলখাগড়ার জঙ্গল হয়ে যায়। বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে সেগুলো ডাঁটো হলে, জমিদারের লোক কেটে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে আসে। গাঁয়ের লোক জ্বালানী ও ঘর ছাওয়ার কাজে লাগাতে সে সব কিনে নিয়ে যায়। তারপর বর্ষা এলে আবার নদীতে বান ডাকে।

মটরু যতদিন কুস্তী নিয়ে মত্ত ছিল, অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হত

না। ঘাট থেকেই তার বেশ আমদানী হয়ে যেত। দুধ, দই ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এত পাওয়া যেত যে দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যেত। কোনো গোয়ালা তার জন্যে বরাদ্দ দুধ না দিয়ে নৌকোয় পা রাখত না। কোনো বানিয়া মটরুকে 'কর' না দিয়ে সে পথ পেরত না। মটরুর পক্ষে এই যথেষ্ট ছিল। খাওয়া, ইচ্ছে মতন শাস্তি বিধান করা আর নদীর ঘাটে বসে বসে নিজের সুগঠিত শরীর প্রদর্শন করা ছাড়া আর কোনো কাজই ছিল না।

কুস্তীর দিন শেষ হয়ে সংসারে প্রবেশ করার পরে এই নীতিহীন জীবনও শেষ হল। মটরু তার ঝুপড়ির চারপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করে, শ্বশুরের কাছ থেকে হাল ও বলদ নিয়ে এসে চাষের কাজ শুরু করে দিল। নদীর জল সরে যাওয়া পলি মাটিতে এমন ফসল ফলল যে লোকে দেখে তাজ্জব।

দু তিন বছরের মধ্যে মটরুর ঝুপড়ি বড় হল। একটি দুধেল মোষ ও এক জোড়া বলদ দরজার সামনে বাঁধা পড়ল। মটরুর সাহস বেড়ে গেল। সে ক্ষেতের পরিধি আরো বাড়িয়ে দিল। সাহায্যের জন্য একজন উপযুক্ত শ্যালককে কাছে এনে রাখল। অনেক পরিশ্রম করল, আর তার পরিশ্রমের ফল সোনার ফসল হয়ে ক্ষেত ভরিয়ে দিল।

জমিদারের কানেও খবর পৌঁছল। তাঁর ধারণাও ছিল না যে ঐ জমিতে এমন ফসল ফলতে পারে। তিনি তো বনঝাউ আর নলখাগড়াতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ফসলের পরিমাণ দেখে গ্রামাঞ্চলের চাষীদেরও চোখ ঠাঁটালো। কিন্তু মটরুর মতো তাদের সাহস ছিল না যে তারা জঙ্গল কেটে ফসল ফলাবে। তারা জমিদারের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিল, চাষ করার জন্যে জমি চাইতে। জমিদারও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। দ্বিগুণ, চতুর্গুণ টাকার দাদন নিয়ে চাষীদের জন্যে জমির বিলিব্যবস্থা শুরু করলেন।

খবর পেয়ে মটরুর তো মাথায় হাত। সে গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষীদের বোঝাতে লাগল, এমন বোকামি তারা যেন না করে। মা গঙ্গার ফেলে রেখে যাওয়া জমিতে জমিদারের কী অধিকার আছে? তিনি সেই জমির জন্যে টাকা নেবেন কেন? যার ইচ্ছে জঙ্গল সাফ করে চাষ করুক না। জমিদারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কী? কেন তারা এই নতুন নিয়ম তৈরি করে জমিদারকে সুবিধা দান করছে?...

গরীব চাষীরা অত শত বোঝে না। তারা তো মটরুকেই সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। মনে করেছিল, মটরুই তাদের বাধা দেবে। এখন মটরু নিজেই তাদের ডাক দিচ্ছে। তাদের খুব অনুশোচনা হল, জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তো তিনবছরের জন্যে জমির বায়না বাবদ টাকা আগাম দিয়ে এসেছি মটরু ভাই। আগে যদি জানতাম...'

'এখনও দেরী হয়নি, তোমরা নিজেদের টাকা ফেরৎ চেয়ে নাও।' মটরু তাদের বোঝাল, 'তোমরা বলে দাও যে তোমাদের জমি চাই না। হয়ত এ বছর চাষ করতে পারবে না, কিন্তু পরের বছর কে তোমাদের আটকাবে? মা গঙ্গার কোল তো তোমাদের সকলের জন্যে। সেই জমির জন্যে তোমরা শুধু শুধু দেনা পাওনার ব্যাপার টেনে

আনলে। মনে রেখো, যদি একবার জমিদারের পাল্লায় পড়ো তো শুধু তুমিই নয়, তোমার ছেলেপুলেরাও এই লোহার শিকলে চিরকালের মতো জড়িয়ে পড়বে। ওঁর লোভ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে, আর একদিন তোমার সবকিছু আত্মসাৎ করবে। তার চেয়ে চল, জমিদারের মুখাপেক্ষী না হয়ে সকলে একত্রে জোট বেঁধে এই জমির উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করি। জমিদার আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মা গঙ্গা কী তার পৈতৃক সম্পত্তি? গঙ্গার জলের মতো গঙ্গার জমিতেও আমাদের সকলের সমান অধিকার। যে জিনিসে আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, তা জমিদারের মনে করে আমরা তো নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছি। তোমরা আমার কথা শোনো,—আমার সঙ্গে থাকো। দেখি জমিদার আমাদের কী করতে পারে।'

চাষীরা জমিদারের কাছে গিয়ে নানান অজুহাত দেখিয়ে তাদের বায়নার টাকা ফেরৎ চাইল। শুনে জমিদার হেসে উঠলেন। জমিদারের তহবিলে জমা পড়া টাকা আর সাপের মুখে ধরা পড়া ইঁদুরের একই দশা। ইঁদুর যতই ছট্‌ফট্ করুক, কিচ্ মিচ্ করুক, একবার আটকা পড়লে তার পক্ষে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। বেচারা চাষীরাই বা কী করবে? কোনো রসিদ-টসিদও ছিল না তাদের কাছে। তবে এর ফলে এইটুকু ভালো হল, অন্য চাষীরা আর জমির বায়না নিতে জমিদারের কাছে ছুটল না। হঠাৎ জমির ব্যাপারে চাষীরা পিছিয়ে যাওয়ায় ও আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জমিদার ক্ষেপে গেলেন। খবর নিয়ে জানতে পারলেন, সব কিছুর জন্যে দায়ী মটরু সিং। জমিদার মটরুকে ডেকে পাঠালেন।

নদীর তটে মটরুর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। সে সেখানকার মুকুটহীন রাজা। জমিদারও তাকে ঘাঁটাতে সাহস করত না। ঐ অঞ্চলে এমন কথাও প্রচলিত ছিল যে মটরু পালোয়ানের কয়েকশো লাঠিয়াল আছে। সে চাইলে দিন দুপুরেই লুটপাট করতে পারে। ঐ কারণে সকলেই তাকে খাতির করে চলত। তাকে সেলাম না করে কেউ তার বাড়ির সীমা পেরোতো না।

ডাক পড়েছে শুনে মটরু চটে গেল। সে বলে পাঠাল যে মটরু জমিদারের আসামী নয়, যার গরজ সে যেন নিজে এসে তার সঙ্গে দেখা করে।

এসব সুযোগ কাজে লাগাতে জমিদার ভালই জানেন। এক অতি ধুরন্ধর কর্মচারীকে শিখিয়ে পড়িয়ে মটরুর কাছে পাঠানো হল।

কর্মচারীটি 'জয় গঙ্গা' বলে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানাল। তারপর দুই হাত কচলে অতি নম্রভাবে বলল, 'ওপারে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম পালোয়ানজীর সঙ্গে দেখা করে যাই।'

মাঘ মাসের সকাল। নদীর জল থেকে ধুঁয়ার মতো ভাপ উঠছে। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। সূর্যের দুর্বল রশ্মি যেন কুয়াশার জালে আটকা পড়েছে। হু হু করে পশ্চিমী বাতাস বইছে। যতদূর চোখ যায় ফসলে ভরা গমের ক্ষেত। শস্যের

উপর জমে থাকা কুয়াশা মুক্তোর মতো ঝিকমিক করছে। শিশিরস্নাত হয়ে চারাগুলি পুষ্ট হচ্ছে।

মটরু মোটা কাপড়ের লুঙ্গী ও কুর্তা পরে বলদগুলোকে জাব দিচ্ছিল। কুর্তার হাতা গোটানো। ডানহাত কনুই পর্যন্ত ভিজে। এক্ষুণী সে ডাবায় খুদ মিশিয়ে এসেছে। বলদগুলি ডাবার ভেতরে মুখ ডুবিয়ে ভোঁস ভোঁস শব্দে জাব খাচ্ছে। একটির পিঠে বাঁ হাত রেখে মটরু চোখ তুলে কর্মচারিটিকে দেখল, 'নৌকো ছাড়তে তো দেরী আছে, তামাক খাবে না কী?' বলে আগুনের কাছে এসে বসল। কর্মচারিটিও কাছে এসে একটি চাটাই পেতে বসল। মটরু একটা খুরপি দিয়ে আগুনটাকে একটু উস্কে দিল। তারপর হাতে পায়ে সেঁক নিতে নিতে হাঁক দিল, 'লখনা, কল্কেটা দিয়ে যা তো।' লখনা মটরুর চার বছরের ছেলে। উলঙ্গ শরীরে সে এক হাতে কল্কে ও অন্য হাতে তামাক নিয়ে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর এক ছুটে কাছে এসে, কল্কে-তামাক বাপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সেখানেই বসে পড়ে ওদের দেখাদেখি আগুনে হাত পা সেঁকতে লাগল। সুন্দর, সুগঠন, শ্যামলবরণ শিশুটিকে কর্মচারী প্রশ্ন করল, 'কীরে, তোর শীত করে না?'

বালক একবার চোখ তুলে তাকে দেখল, তারপর হেসে আবার মুখ লুকোলো। মটরু বলল, 'কিছু পরে-টরে না। ঘুমনোর সময়ও গায়ে চাপা দিলে টেনে খুলে দেয়।'

'তোমারই তো ছেলে পালোয়ানজী।' কর্মচারিটি তোষামোদের গলায় বলল।

'হ্যাঁ, পাঁচবছর আগে পর্যন্ত আমিও জানতাম না কাপড়ের কী প্রয়োজন। একটা ল্যাঙট বা লুঙ্গিই যথেষ্ট ছিলো। মা গঙ্গার মাটি আর জলের গুণই এমন যে গ্রীষ্ম-শীত, অসুখ-বিসুখ কোনো কিছুর পরোয়া করতাম না। কী করি বল, শ্বাসের অসুখ হয়ে আমার শরীর নষ্ট হয়ে গেল।' এই বলে মটরু কল্কের উপর আরো কয়েকটা জ্বলন্ত কয়লা ফেলে দিল। 'শত্রু নিপাত যাক...' মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিয়ে মটরু বলল, 'ছেড়ে দাও ভাই ওসব কথা, নাও তামাক খাও। ভগবান সকলের মঙ্গল করুন।' 'হ্যাঁ ভাই', কল্কে মুখে লাগিয়ে কর্মচারীটি বলে, 'তোমার মতো দুটি দেখিনি, শত্রুরও মঙ্গল চাইছো।' কথা শেষ করে সে কল্কেতে টান দেয়। 'কোন গাঁয়ে থাকো? দেখে কায়স্থ মনে হচ্ছে।' মটরু জিজ্ঞেস করে। 'বালুপুরে থাকি, আর জিন্দাপুরের সেরেস্তায় কাজ করি।' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কর্মচারীটি সরাসরি কাজের কথায় চলে আসে, 'শুনছিলাম জমিদার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তুমি যাওনি।' মটরুর টনক নড়ে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমি কী কারুর অধীন যে...' 'আরে না না, সে কথা বলছি না।' মাঝখানেই তাকে থামিয়ে কর্মচারীটি বলে ওঠে, 'তুমি রাজা মানুষ। নিজের যোগ্য কাজই করেছ। আমি তো শুনেছি যেসব জমিদারের নদীর ধারে জমি আছে তারা সকলে মিলে তোমাকে একটা বড় অংশ লিখে দেবার কথা ভাবছেন। তুমি...' 'ওরা লেখার কে?' উত্তপ্ত হয়ে মটরু বলে, 'ওখানে শুধু মা গঙ্গার জমিদারী।

তাকে ছাড়া আমি তো কাউকেই জানিনা। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি ওদের বলে দিতে পার যে নদীর পারের জমিতে যদি কোনো জমিদারের ব্যাটাকে দেখতে পাই তো তার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।'

'আরে ভাই তুমি তো শুধু শুধু চটে যাচ্ছ। আমার কী গরজ যে কাউকে কিছু বলতে যাব? কথা উঠল, তাই বলছিলাম। আমি তো এমন কথাও শুনেছি যে পালোয়ানজী যদি চান তো জমির দাদনের টাকা থেকে তাঁকেও ভাগ দেওয়া হবে...' মটরু হেসে ফেলল। তারপর চোখ পাকিয়ে বলল, 'মটরু পালোয়ান পাপের পয়সা ছোঁয়না। মা গঙ্গা ছাড়া কারুর সামনে সে কখনো হাত পাতেনি। দেখব কী করে কোনো জমিদার চাষীদের কাছে টাকা নিয়ে জমির বিলি ব্যবস্থা করে। মরদের যে কথা সেই কাজ। মা গঙ্গার নামে শপথ করে বলছি লালা...'

'আমি তো চাকর ভাই। তোমার মতো রাজা লোকের সঙ্গে কোন সাহসে কথা বলব? জমিদারের জুতো সেলাই করতে করতেই বুড়ো হয়ে গেলাম। কিছু মনে কোরোনা, এই জমিদার মহা শয়তান। তোমার মতো সাধাসিধে লোকের পক্ষে ওকে না ঘাঁটানোই ভালো। ওরা উঁচু-নীচু, সত্যি-মিথ্যে, আসল-নকলের বিচার করে না। ওপর মহলের সঙ্গে ওদের ওঠা-বসা। তুমি কী ওদের সঙ্গে পারবে? কাগজ-পত্রও তো সব ওদের নামে। আইনের মার-প্যাঁচ দেখিয়ে ওরা তোমাকে নাচিয়ে ছাড়বে।'

'আইন নিয়ে ওরা ওদের বাড়িতে বসে থাক। আমি শুধু জানি এ হল মা গঙ্গার জমি। যার ইচ্ছে এস, মেহনত কর, ফসল ফলাও, খাও। জমিদার এ দিকে নজর দিলে আমি তার চোখ গেলে দেব। এতদিন এইসব আইন-কানুন কোথায় ছিল? আমি খার ঝরালাম, ফসল ফলল, এখন দেখে চোখ ঠাটাচ্ছে। জমিদারের অধিকার ফলাতে আসছে! কাঁধে লাঙল নিয়ে আসুক তো দেখি। এখানে চাষ করা কী সহজ কাজ? সরল চাষীদের বোকা বানিয়ে টাকা লুটছে। বেচারীরা কষ্ট করবে, আর উনি গদিতে বসে মজা লুটবেন। এসব আমি বরদাস্ত করবো না। ওদের বলে দিও এ হল মা গঙ্গার এলাকা। কেউ যদি পা বাড়ায়, তাহলে ঐ জলের ধারা দেখছ? একটাকেও প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। এখন যাও নৌকো ছাড়ার সময় হল।'

কর্মচারীটি মুখ কালো করে উঠে পড়ল। মটরু নিজের মনে গজরাতে লাগল, 'হুঁঃ। মা গঙ্গার বুকের রক্ত চুবে খেতে এসেছে সব!'

□

মটরু আর তার লাঠিয়ালদের সঙ্গে পেরে ওঠা যে সহজ নয় এ কথা জমিদার যেমন জানতেন, তেমনি পুলিশও। এ যেন জেনেশুনে সাপের গর্তে হাত দেওয়া।

মাইলের পর মাইল জুড়ে বনঝাউ আর নলখাগড়ার জঙ্গলের মধ্যে ঠিকমতো

কোনো রাস্তা নেই। কোনো নতুন লোক সেখানে এসে পড়লে নির্ঘাৎ পথ হারাবে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নদীর ঘাটে যাওয়ার আঁকা-বাঁকা উঁচু নীচু রাস্তা আর অদৃশ্য পাকদণ্ডী শুধু ঐ এলাকার বাসিন্দারাই চেনে। তবু সন্ধ্যের পর তারাও সাহস করে সে পথ মাড়ায় না। জঙ্গলের ভেতর ডাকাত দলের আড্ডা আছে, এমন কথা শোনা যায়। এমন অবস্থায় মটরুর সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া। পরিস্থিতি বুঝে জমিদার পিছিয়ে গেলেন। তবে পুলিশের সঙ্গে শলা পরামর্শ চলতে লাগল। প্রস্তুতি চলতে লাগল,—শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

প্রতি বছরের মতো জৈষ্ঠের শেষে ফসল কেটে-ঝেড়ে মটরু তার শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সেইসঙ্গে ছেলে মেয়েগুলোকেও পাচার করল। আবার সেই ভবঘুরে জীবন আরম্ভ হবে। মা গঙ্গা যে কখন ফুলে ফেঁপে উঠবেন তার কী কিছু ঠিক আছে? ক্ষিপ্র জলস্রোত থেকে বাঁচিয়ে ঝুপড়িটা আরো উপরে সরানোর বিদপজনক কাজটা খুব দ্রুত সারতে হয়। এই রকম সময়ে বাচ্চারা সঙ্গে না থাকাই ভালো। তার শ্বশুর তাকেও চলে আসার জন্যে বলে, কিন্তু নদীর হাওয়া না হলে মটরুর ঘুম আসে না। মা গঙ্গাকে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে থাকতে চায় না সে। কুয়ার জলে তার তেষ্টা মেটে না।

এবার মটরু আরো একটা কাজ করল। সে গ্রামে গ্রামে খবর পাঠাল, যার ইচ্ছে বনঝাউ আর নলখাগড়া কেটে নিয়ে যেতে পারে। জমিদারের কাছে কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। মা গঙ্গার জিনিসে সবার সমান অধিকার। চারিদিক থেকে চাষী, মজুর আর গরীব গ্রামবাসীরা মিলে হৈ হল্লা শুরু করল। যাকে দেখো সেই মাথায় করে বনঝাউ বা নলখাগড়ার গোছা নিয়ে দৌড়চ্ছে।

খবর পেয়ে জমিদার রেগে আগুন। হাজার হাজার টাকার লোকসান শুধু নয়, প্রতি বছরের নিশ্চিত আমদানীতে বাধা পড়ছে। তিনি পুলিশের কাছে পরামর্শ চাইলেন, কী করা উচিত। পুলিশ আপাতত চুপচাপ বসে থাকার পরামর্শ দিল। এই সময়ে কিছু করা শুধু মটরুর বিরুদ্ধতা নয়, সেইসঙ্গে অসংখ্য চাষী, মজুর ও গরীব গ্রামবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা,—কারণ এ ব্যাপারে তারাই লাভবান। থানায় বড় জোর এক ডজন বন্দুক আছে, তাতে এত শক্তি কোথায় যে হাজার হাজার লাঠির মোকাবিলা করে? জায়গাটাও পাহাড়ি জঙ্গল,—একবার পথ হারালে বেরিয়ে আসা মুস্কিল। ওরা তো জায়গাটার অন্ধি সন্ধি জানে। অবশ্য জিলা শহর থেকে গার্ড আনানো যায়, কিন্তু জমিদারের যা লোকসান গেছে তার উপর আবার গার্ডের খরচ এসে পড়বে। অজানা-অচেনা গার্ড এখানে এসেও কিছু করে উঠতে পারবে কী না কে জানে। ঐ জঙ্গলে কাউকে খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ নয়।—নাঃ, এখন মটরুকে ঘাঁটানো একেবারেই উচিত হবে না। সময় আসুক, তখন দেখা যাবে। যাতে সাপও মরে আর লাঠিও ভাঙে না।

জমিদার আর কী করেন অনিচ্ছায় তেতো ওষুধ গেলার মতো সবই স্বীকার করে নিলেন।

এদিকে মটরু মহা উল্লাসে জঙ্গল কাটাচ্ছে। চাষীরা জেনেছে, মটরুভাই যা বলছে সেটাই ঠিক। এ জায়গা কোনো জমিদারের নয়। জমিদারের চোদ্দ পুরুষের কাউকে কী কখনো এই তল্লাটে দেখা যায়? মা গঙ্গার জয়ধ্বনিতে তারা চারিদিক মুখরিত করছে। নদী খিলখিল করে হেসে বয়ে চলেছে।

সে বছর হাজার হাজার চাষী, মজুর ও অন্যসব গরীব গ্রামবাসীর কুঁড়েঘর নতুন চালে ছাওয়া হল। সারা বছরের জ্বালানীর সংগ্রহ তাদের ঘরে মজুত হল। সকলে দু হাত তুলে মটরুকে আশীর্বাদ জানাল।

□

দশহরা আসার আগেই নদী ফুলে উঠছিল। এবার বর্ষার আগেই মুষলাধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হল। দিনে দু তিনবার মটরুকে ঝুপড়ি সরাতে হচ্ছিল। জল খুব দ্রুত বাড়ছিল। ঘণ্টায় দশ বিশ হাত ডুবে যাচ্ছিল অনায়াসে।

দিনের কথা ছেড়েই দাও, রাত্রেও মটরু ঘুমোতে পারে না। নদীর তো এই অবস্থা। কে জানে কখন ঝুপড়ি ডুবে যাবে। মটরু উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। উপরে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর নীচে প্রবল জলস্রোতের ভয়ংকর শব্দ। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়া নদীতটের শব্দও শোনা যাচ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার কর্ণভেদী আওয়াজ আর ব্যাঙের ডাকে চতুর্দিক মুখরিত। মনে হচ্ছে দুই শব্দ যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। চারিদিক ঘন অন্ধকার। কখনো একূলে, কখনো ওকূলে জল বেড়ে উঠছে। মটরু বসে বসে মা গঙ্গার এই ভয়ংকরী রূপ দেখছে। যে মা পরম স্নেহে সন্তানকে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়ায়, সেই আবার কখনো রাগ করে ছেলেকে মারধরও করে।

শ্রাবণ মাস নাগাদ মটরুর ঝুপড়ি নিকটবর্তী এক গ্রামের কাছে সরে এল। এইসব দিন মটরুর ভালোই লাগে। মা যেন রাগ করে তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আর ধমক দিয়ে বলছেন, 'দাঁড়া, একবার তোকে ধরি, তারপর এমন শাস্তি দেব না...' আবার এর উল্টোটাও উপভোগ করে মটরু, যখন মা আগে আগে ছোটেন আর সে হাত বাড়িয়ে মায়ের পেছন পেছন দৌড়য়,—কখন সে মাকে ধরে ফেলবে আর মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠে বলবে, 'মা, তুমি কেন এতদিন রাগ করেছিলে?' মা ছেলের এই খেলা প্রতিবছরই চলে। কখনো মা ধরতে চান, ছেলে পালায়; কখনো মা পালান, ছেলে পিছু পিছু ছোটে! কত যে আনন্দের এই খেলা!

তারপর নদী যখন সমুদ্রের রূপ নিল, তার কোনো পারে মটরুর জন্যে একটুও

জায়গা বাকী রইল না, তখন বাধ্য হয়েই তাকে মায়ের আঁচল ছাড়তে হল। কাছেই এক গ্রামে মটরু তার ঝুপড়ি বাঁধল। বিয়োগের এই দিনগুলিতে মটরু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অশ্রুভরা চোখে নদীর তীরে বসে মায়ের ছড়িয়ে যাওয়া আঁচলের মতো উচ্ছ্বসিত জলধারার দিকে তাকিয়ে থাকে। উদ্দাম জলধারা প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে প্রলয়ের ধ্বনি তুলে বয়ে যায়। মাঝে মাঝে কোথাও কোনো শুশুক কালো বিন্দুর মতো হঠাৎ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। কোথাও কোনো গাছ ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে পাক খায়, কেউ যেন আঙুলের ডগায় তার চক্র ঘোরাচ্ছে। মটরুর মন এক বালকের মতো ঐ ধারায় লাফিয়ে পড়ে ঐ চক্র কেড়ে নিয়ে আঙুলে ঘোরাতে চায়। মায়ের চেয়ে ছেলের শক্তি কী কম নাকি? কখনো কারুর ভাঙা ঘর জলের ধারায় ভেসে যেতে দেখলে ব্যথিত হয়ে সে বলে ওঠে, 'এ তুই কী করলি মা? ছেলের ঘর ভাঙতে একটুও কষ্ট হল না তোর? এত রাগই বা কিসের, তুই বলত।'

বস্তিতে তার ভালো লাগে না। যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। জংলী ফুলের মতো বস্তীতে সে আধমরা হয়ে বেঁচে থাকে। সীমাহীন সেই ময়দান, নির্মল হাওয়া, নরম মাটি, অপর্যাপ্ত রোদ আর সেই স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্যে তার প্রাণ ব্যকুল হয়। কখনো তার মনে এত অস্থির হয় যে সে ভাবে জলে ঝাঁপ দিয়ে শরীর মন ঠাণ্ডা করে জলের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তখনই আবার আদুরে বৌটা আর বাচ্চাগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। সে নদীর তীর ছেড়ে উঠে আসে। ভয় হয়, নদীর ধারে বসে থাকলে যদি সত্যিই সে জলে ঝাঁপ দেয়।

মাঝে মাছে অনেক উপরোধে সে শ্বশুরবাড়ি যায়, কিন্তু দু'এক রাত্রের বেশী থাকতে পারে না। মনে হয়, মা যেন ডাকাডাকি করছেন। ফিরে আসার পরে অনেকক্ষণ নদীর জলে লুটোপুটি না করা পর্যন্ত সে মনে শান্তি পায় না।

□

সেদিন রাত্রে নদীর তীরে বসে বসে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল তার। সে উঠে পড়ল। ঝুপড়িতে গিয়ে দরজার কাছে পড়ে থাকা পাতলা চাটাইটার উপরেই শুয়ে পড়ল। বড় সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। জলের স্রোত যেন ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে বয়ে চলেছে, পাড়ের কাছে জলের শব্দ যেন তাল দিচ্ছে সেই গানে। বড় মিঠে ঘুম নামল মটরুর চোখে। ঘুমের মধ্যেই মনে হল তার বুকের উপরে খুব ভারী কোনো বোঝা চাপানো হয়েছে। চমকে চোখ চেয়ে আততায়ীর টর্চের আলোয় দেখতে পেল দুটি জোয়ান লোক তার বুকের উপরে চড়াও হয়েছে। হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই শিকলের ঝনঝনানি কানে গেল। বুঝতে পারল তার হাত বাঁধা। ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই চারিদিকে বল্লমধারী কনস্টেবলের দল দেখতে পেল।

সে সবই বুঝল। আক্রোশ ও ঘৃণায় কেঁপে উঠে সে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল।

যখন থেকে সে এই বস্তিতে এসেছে, তখন থেকেই পুলিশ তার পেছনে লেগেছে। আজ সুযোগ পেয়ে তাকে ধরে ফেলল। রাতারাতি মটরুকে হাতকড়া আর বেড়ি পরিয়ে জেলার হাজতে পৌঁছে দেওয়া হল। এমন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হল যাতে গাঁয়ের লোক টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে না পারে।

মোকদ্দমার রিপোর্ট, সাক্ষীদের বিবৃতি সব আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। মটরুর শ্বশুর থানায় খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে ডাকাতির অভিযোগে মটরুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ মটরুর ঝুপড়িতে তল্লাসী করে যেসব গহনা ও জিনিসপত্র পেয়েছে, সেগুলো জিন্দাপুরের জমিদার নাথুনী সিং-এর সম্পত্তি। সব জিনিস একে একে সনাক্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই মামলা কাছারিতে উঠবে। নথিপত্র তৈরি হচ্ছে। যে শুনছে, সেই হাঁ হয়ে যাচ্ছে। কেউ দুঃখে, কেউ বিস্ময়ে। কিন্তু এই ব্যাপারে পুলিশের কঠিন শাসন অমান্য করে জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে কারুরই সাহস হল না। মটরু সর্দারের দলের প্রায় পঞ্চাশজন ডাকাত এখনও লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে, এমন কথাও রটিয়ে দেওয়া হল। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করার জন্যে ছুটোছুটি করছে। 'আজ দুজন ডাকাত গ্রেপ্তার হলো', 'আজ তিনজন গ্রেপ্তার হলো', এমন কথা দু চারদিন অন্তর শোনা যেতে লাগল। পুলিশ চারিদিকে অদ্ভুত হৈ চৈ ফেলে দিল।

কয়েকমাস ধরে ভেবে চিন্তে যে মামলা তৈরি হয়েছিল তাতে কোনো খুঁৎ ছিল না। তা ছাড়া জিলার ছোট বড় সব অফিসারদের হাতই এমন গরম করা হয়েছিল যে তারা সবকিছু চুপচাপ হজম করে গেলেন।

ডেপুটি সাহেবের কাছারি থেকে মামলা সেশন কোর্টে পৌঁছল। শ্বশুর ও শ্যালকের পক্ষে যতটা সম্ভব তাঁরা করলেন। কিন্তু ফল তো আগে থেকেই নির্দ্ধারিত ছিল। মটরু তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। তিনদিনের মধ্যেই তাকে রাতের গাড়িতে বেনারস জিলা জেলে পাচার করে দেওয়া হল।

ছয়

বৌদির জীবন যেন একটি সাধিকার জীবন। বুকের মধ্যে স্বামীর স্মৃতি লুকিয়ে রেখে কোনো না কোনো কাজে নিজেকে সারাদিন ব্যস্ত রাখে। দুই চোখে অশ্রুধারা ঝরে, আর দুই হাত কাজ করে চলে। শ্বশুর-শাশুড়ি চুপচাপ সব দেখেন, কোনো কথা বলেন না। এই বিধবাকে সান্ত্বনার কোন কথা বলবেন তাঁরা? যদি কোনো সন্তান থাকত, তার মুখ চেয়ে বেঁচে থাকার কথা বলা যেত। এর তো সন্তানও নেই। রিক্ত বৃক্ষের মতো

এর জীবন, পত্রে-পুষ্পে, ফলে-ফুলে যা কোনোদিন ভরে উঠবে না। সম্পূর্ণ ব্যর্থ এক জীবন। ধরিত্রীর এক অর্থহীন অপচয়। রিক্ত বৃক্ষের একটা উপযোগিতা অবশ্যই আছে,—কেটে এনে জ্বালানীর কাজে লাগানো যায়। গৃহস্থ জীবনে এই সব বিধবাদের উপযোগিতা প্রায় জ্বালানী কাঠের মতোই,—সারাজীবন জ্বলতে থাকে। নিজে জ্বলে-পুড়ে গৃহস্থের সেবা করা, যে সেবার ফল ভোগ করবে অন্যলোক আর সে নিজে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বৌদির অবস্থাও সেইরকম। সে শুধু কাজ করে যায়। বুড়ি শাশুড়ি ঘরের কোণে বসে ছেলেদের স্মরণ করে দিনরাত কাঁদেন। একের পর এক বিপত্তির আঘাতে পঙ্গু শ্বশুর এক তীব্র মানসিক পীড়ায় ভোগেন। এ কী হল? কী ছিল, আর কী হল। অতীতের সুখের দিনগুলো স্মরণ করে হাহাকার করে ওঠেন, 'হা ঈশ্বর! এ তুমি কী করলে! আমি কী পাপ করেছিলাম যে এমন দিনও দেখতে হলো?'

কখনো এমনও হয় যে বাড়ির তিনটি প্রাণী একে অন্যকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একত্র হয়, তারপর কথায় কথায় কী যে হয়ে যায়, লাজ লজ্জা সংকোচ ভুলে তিনজনই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। প্রতিবেশীরা ছুটে আসে, জোর করে তাদের আলাদা করে। চোখের জল মুছিয়ে অনেক বুঝিয়ে তাদের শান্ত করে। তারপর সমস্ত পরিবেশ হঠাৎ শ্মশানের মতো শান্ত হয়ে যায়। যেন কোনোদিন কোনো জীবিত প্রাণী এখানে থাকেনি। ব্যথায় বুক ভেঙে গেলেও তারা একটিও শব্দ উচ্চারণ করে না। প্রতিবেশীরা বিদায় নিলে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হায়, কী ছিল আর কী হয়ে গেল। বেচারা গোপী যদি ছাড়া পেয়ে ফিরে আসত, তবু এরা কিছু সান্ত্বনা পেত।

রাত্রে বৌদির ঘুম আসে না। একটু তন্দ্রা এলেই ভয়ানক কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে সে চেঁচিয়ে ওঠে, তারপর চুপি চুপি কাঁদে। অতীতের এক একটি কথা মনে পড়ে আর বুক ভেঙে যায়। অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধতা সমগ্র জীবনের ইতিহাস সামনে মেলে ধরে। বৌদি অস্থির হয়ে বার বার পাশ ফেরে আর একটি একটি করে পৃষ্ঠা ওল্টায়। যখন অসহ্য হয়ে যায় তখন উঠে রান্নাঘর থেকে এক কাঁড়ি বাসন বার করে উঠোনে গিয়ে মাজতে বসে। বাসনের শব্দ শুনে ঘুম চোখে শাশুড়ি বলেন, 'ও বৌ, এখনই উঠে পড়লি? এখনও যে অনেক রাত বাকী। যা, গিয়ে শুয়ে পড়।'

বৌদি জবাব দেয় 'রাত কই মা? শুকতারা দেখা যায়। ভোর হয়ে এল।'

'এখনও আমার ঘুম পুরো হল না, আর তুই বলছিস ভোর হয়ে এল। যা বউ, শুয়ে পড় গিয়ে। খাবার লোক কে আছে যে মাঝরাতে বাসন মাজতে বসলি? যা যা আর একটু ঘুমিয়ে নে।'

বৌদি আর জবাব দেয় না। শাশুড়ি শুয়ে শুয়ে কাতরান, বিড়বিড় করেন, 'হে রাম. হে রাম', তারপর আবার ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যান। বৌদি নিঃশব্দে সব বাসন মেজে ধুয়ে ফেলে। রান্নাঘর গোছায়। তারপর স্নান সেরে, কাপড় বদলে. ঠাকুর ঘরে

যায়। ঠাকুর ঘর পরিস্কার করে প্রদীপ জ্বালিয়ে, মূর্তির সামনে বসে রামায়ণ খুলে ধীরে ধীরে পড়ার চেষ্টা করে। সে কিছুই বুঝতে পারেনা। লেখাপড়া কিছু শেখেনি। ছেলেবেলায় কিছুদিন ভাইয়ের সঙ্গে পাঠশালায় গিয়েছিল। সেই সময় অক্ষর পরিচয় হয়েছিল, বানানও শিখেছিল। তারপর মা পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। মেয়েদের আবার লেখাপড়া শেখবার কী দরকার? যেটুকু শিখেছিল সে ধীরে ধীরে সবই ভুলে গেল। আর এখন যখন সময় কাটতেই চায় না, সেই ভুলে যাওয়া অক্ষর সে নতুন করে চেনার চেষ্টা করে। বাড়িতে রামায়ণ ছাড়া দ্বিতীয় বই নেই। সেই বই নিয়েই পড়তে চেষ্টা করে। এক একটি শ্লোক পড়তে অনেকক্ষণ সময় লাগে। অক্ষরের সঙ্গে অক্ষর মিলিয়ে শব্দ তৈরি, সেই শব্দ বার বার উচ্চারণ করার পর দ্বিতীয় শব্দে যায়। তারপর দুটি শব্দ আবার একত্রে পড়ে। এইভাবে পুরো পংক্তিটি শেষ করার আগে শব্দটি প্রায় বিশবার উচ্চারিত হয়।

এইভাবে সময় কাটে। কিছু না বুঝেও মনে একধরণের আধ্যাত্মিক সুখ ও সান্ত্বনা পায় সে। বুঝতে পারে আরো ভালো করে পড়তে শেখা চাই। সময় কাটানোর এর চেয়ে ভলো উপায় আর নেই। দুঃখী মানুষের সময় কাটানোই সবচেয়ে বড় সমস্যা। তার দুঃখের শেষ তো সারাজীবনেও হবে না। এক বিধবা নারীর জীবনে সুখ এক বৃথা কল্পনা মাত্র।

সকালে শ্বশুর-শাশুড়ি জেগে ওঠার আগেই ঘরদোর পরিস্কার করে নেয়। ক্ষেত মজুরটি আসে। তাকে দিয়ে মোষ দোয়ায়। গোলাঘর থেকে মোষের জন্যে জাব এনে দেয়। তারপর জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে মজুরটিকে চাষের কাজে জমিতে পাঠিয়ে দেয়। পুরোন এই ক্ষেত মজুরটি বড়ই বিশ্বস্ত। চাষবাসের সব কাজ এখন সেই দেখাশোনা করে। সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সে তার কাজ করে ও বৌদিকে নিয়মিত হিসেব দেয়।

শ্বশুর জেগে উঠেই বৌকে ডাকেন। বৌদি ক্ষিপ্রহাতে কল্কেয় আগুন দিয়ে হুঁকো-কল্কে শ্বশুরের হাতে দেয়। শাশুড়ির কোনো কাজেই মন নেই, কাজেই লাজ-লজ্জা ভুলে বৌদিকে শ্বশুরের সব কাজ করতে হয়।

খাটিয়ায় বসিয়েই সে তাঁর হাত মুখ ধুইয়ে দেয়, দুধ গরম করে খাওয়ায়। নতুন করে তামাক সেজে আনে, তারপর ওষুধ নিয়ে মালিশ করতে বসে। শ্বশুর গুড়ুক গুড়ুক হুঁকোয় টান দেয়, হঠাৎ কোনো ব্যথার জায়গায় বৌ-এর হাত পড়লে আর্তনাদ করেন, 'ও বৌ, একটু সামলে, ওঃ, আঃ!'

বৌ আবার ঘরের কাজে লেগে যায়। ঝাড়া, বাছা, কোটা, পেষা থেকে রাঁধা, বাড়া, খাওয়ানো পর্যন্ত সব কাজ সে একাই করে। শাশুড়ি ঘরের কোণে বসে বসে কাঁদেন, আর কর্মরতা বৌ এর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বৌদি আর সেই আগের বৌদি নেই। সেই রূপ, রং, যৌবন, দেহ-সৌষ্ঠব কিছুই

নেই তার। সে যেন আগের বৌদির চলমান ছায়া। শীর্ণ, শুষ্ক দেহ, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ, উদাস অশ্রুসজল চোখ, নিষ্প্রাণ ঠোঁট, প্রতি রোমকূপ থেকে যেন করুণার ক্ষরণ হচ্ছে। জীবনের সে এক নিষ্প্রাণ চিত্র, অথবা এক চলমান মৃতদেহ।

হায়, সে কেন বেঁচে আছে? তার স্বামীর সঙ্গে তারও মৃত্যু হল না কেন? ছোটবোন পুণ্যবতী ছিল, ঈশ্বর তাকে ডেকে নিলেন। আর সে, মহাপাপিষ্ঠা নরকভোগ করছে। এই নরকবাস কবে শেষ হবে, এই যন্ত্রণা থেকে কবে তার মুক্তি হবে?

□

কয়েকমাস কেটে যেতে ব্যথার তীব্রতা কমে এলো। একা হাতে সব কাজ সামলাতে বৌদি এখন অভ্যস্থ। অসীম নিরাশার যে বোধ তার অন্তর সর্বদাই বিক্ষত করত, সেই যন্ত্রণাও স্তিমিত হয়েছে। এখন বৌদি মাঝে মাঝে অন্য ভাবনায় ডুবে যায়। কখনো তার হৃদয়ে আবার সেই সুখের অঙ্কুর উন্মীলিত হয়, যা সে কোনোকালে পত্র-পুষ্পে ভরা মহাবৃক্ষ রূপে প্রত্যক্ষ করেছে। স্বামীর সাহচর্যে তার হৃদয়ে যে কোমল ভাবনার উন্মেষ হত, তাকে স্মরণ করে আবার তার সেই অনুভূতি হয়। মনে একটাই প্রশ্ন বার বার জেগে ওঠে, 'জীবনে কী সেই দিন আর কখনো ফিরে আসবে না। সেই মুখ কী কোনোদিন অনুভব করব না আমি?' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মনে এক অদ্ভুত বেদনা। সমগ্র সত্তা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

এইরকম অবস্থায় দেওরের কথা মনে পড়ে যায়। তার অবস্থাও তো একই রকম। তারও সুখের সংসার আজ রিক্ত। তার মনেও আজ একই অনুভূতি। সেও তারই মতো যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

তখনই আবার তার মনের মধ্যে কেউ যেন বলে ওঠে, 'সে তো পুরুষ, জেল থেকে ফিরেই আবার বিয়ে করবে, একটি নতুন জীবন শুরু হবে তার—আবার আগের মতো সুখের জীবন—' মন ব্যথায় ভরে ওঠে। ক্রোধে-ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়। যন্ত্রণার্ত হৃদয় থেকে একটাই প্রশ্ন উত্থিত হয়, 'এমন কেন? কেন এমন হয়? কেন এই বিভেদ? কেন একজন তার রিক্ত জীবনের দহণে তিল তিল করে জ্বলে ছাই হবে, আর অন্যজন তার শূন্য জীবন আবার নতুন করে সাজিয়ে সুখ ও শান্তিতে জীবন কাটানোর অধিকার পাবে?'

সে অস্থির হয়ে ওঠে। না, কখনোই না, এমন হতে পারে না। তারও অধিকার থাকা উচিত যাতে—

এ কেমন চিন্তা জাগল তার মনে? সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বৌদি নিজেই আশ্চর্য হয়। এই তো কালকের কথা, স্বামীকে হারানোর শোকে সে মৃত্যু বরণ করতে চেয়েছিল। আর আজ সে এমন বদলে গেল কী করে? এসব কী ভাবছে সে? এইসব চিন্তা কেন,

কেন জাগছে তার মনে? এইসব ইচ্ছেরা কেন পাখা মেলছে তার হৃদয়ে? সে নিজের মনেই লজ্জিত হয়। কেউ তার মনের কথা জানতে পারেনি তো? না না! লোকে কী বলবে? সকলে মনে করবে সে পাপিষ্ঠা। গালি দেবে তাকে,—স্বামীর মৃত্যুর পর দু'তিন বছরও কাটেনি আর হতভাগি এ কী সব ভাবতে বসেছে! বৈধব্যের পবিত্রতা এ কেমন করে রক্ষা করবে? হায় হায়, কী দিনকালই এলো, কালকের বিধবা আজ...

সে বিবশ ও ব্যকুল হয়। এই মন নিয়ে সে কী করে? এই অপবিত্র চিন্তাকে দূর করে কী করে? সে ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করে, 'ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন সমাজের রীতি রক্ষা করে চলতে পারি, আমার মনের অপবিত্র ভাবনাগুলো দমন করতে পারি। আমার বৈধব্যকে কলঙ্কীত না করি।' কিন্তু সে কোনো শক্তি পেল না ঈশ্বরের কাছে। মন হরিণের মতো চঞ্চল হয়ে উঠল। জোর করে স্বামীর চিন্তায় মন বসাতে চাইত। মনে করত, যতক্ষণ স্বামীর স্মৃতি তার মনে উজ্জ্বল থাকবে ততক্ষণ তার স্খলন হবে না। কিন্তু স্বামীর স্মৃতিও ক্রমে আবছা হয়ে আসছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই স্মৃতিতে নিমগ্ন থাকতে পারে না। কখন যেন স্মৃতি নিজের দিক পরিবর্তন করে। যে স্মৃতি ব্যথা দেয় তা মুছে গিয়ে স্বামী সাহচর্যের সুখের স্মৃতিতে মন নিবিষ্ট হয়। আবার সেই সুখ, সেই আনন্দ ফিরে পাবার জন্যে মন উত্তাল হয়। হৃদয়ে শিহরণ জাগে। পরে সচেতন হয়ে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। এইভাবে এক আশ্চর্য রহস্যময় দ্বন্দ্ব চলতে থাকে তার মনে। সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে কোন পক্ষের জিত হচ্ছে আর কোন পক্ষের হার।

সে বদলে গেল। ঘরের কাজকর্ম, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবায় আর মন রইল না। সেও আনমনা হয়ে কাজ করে। কোনো কাজে দেরী হলে শাশুড়ি বকাবকি করেন, তখন সে মুখের উপরে জবাব দিয়ে দেয়, 'দুটোই তো হাত আমার। নিজেই করে নাও না। ঝি-র মতো দিনরাত খাটছি, তবু 'এটা হয়নি, ওটা হয়নি' শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।' শাশুড়ি শুনে গজ গজ করেন। যা মুখে আসে তাই বলতে থাকেন। বৌদি শাশুড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, তবু সে চুপ করে থাকার পাত্রী নয়। ক্রমশঃ দুজনেই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল, আর ঝগড়াঝাটি বাড়তেই লাগল। এই সংসারে যে দুঃখময় শান্তি বিরাজ করত তা শেষ হয়ে গেল। এ বাড়ির কথাবার্তা এখন পাড়া-প্রতিবেশী সকলের কানে গিয়ে পৌঁছয়। দুটি কুণ্ঠিত, অসুস্থ জীবনের বার্তালাপ,—বিরক্তি, ক্রোধ, হতাশা ও ব্যর্থতায় ভরা।

বৌদি একদিন সকালে গোলাঘর থেকে খোল নিয়ে দালানে এসে মজুরটির হাতে দিলেন। খোলের ঝুড়িটি হাতে নিয়ে মজুরটি বলল, 'ছোট মা, কিছুদিন ধরে একটা কথা মনে হচ্ছে যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।' কাপড়ে লেগে থাকা খোলের কুচিগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বৌদি বলল, 'কী বলবি রে? কিছু চাই?' 'না মা', মজুরটির চোখে করুণা, কণ্ঠে দরদ। সহানুভূতির স্বরে সে বলল, 'আপনাকে দেখে

বড় কষ্ট হয় মা। আপনার এখন কী বা বয়স। সারাটা জীবন কেমন করে কাটাবেন? আপনার সোনার মতো রূপ মলিন হয়ে গেছে। আপনাকে দেখে বড় দুঃখ হয় মা।' মনে হচ্ছিল মজুরটি এবার বুঝি কেঁদে ফেলবে।

বৌদির উদাস চেহারায় কালো ছায়া নামল। সে বলল, 'কী করব বিলরা, ভাগ্যের উপর তো কারুর হাত নেই। বিধাতা আমার সিঁদূর মুছে দিয়েছেন, কপাল পুড়িয়েছেন, এখন কেঁদে কেটেই তো জীবন কাটাতে হবে। তুই দুঃখ করছিস কেন? কাকে দোষ দেব? বিধাতা নিজেই যখন আমার সুখ সহ্য করতে পারলেন না...' বৌদি আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলরা বলল, 'আপনাদের সমাজের কেমন রীতি ছোট মা? এর চেয়ে আমাদের সমাজ তো ভালো। আমার কথাই ধরুন। আমার দাদা মারা গেলেন, তো বৌদির সঙ্গে আমার বিয়ে হল। আমরা ভালোই আছি। আপনাদের উঁচু জাতে জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়...একটা কথা বলি মা, মাঝে মাঝে মনে হয় ছোটবাবুর সঙ্গে যদি আপনার বিয়ে হয়...'

'বিলরা!' উচ্চকুলের অহংকার ফেটে পড়ল, 'আর কক্ষণো এমন কথা মুখেও আনবি না! যে বাড়ির নুন খাস, তার সম্মান রাখতে জানিস না? ফের যদি এই সব কথা শুনি তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি। জানিস না, আমাদের বংশের বিধবারা বরং সজ্ঞানে চিতায় উঠে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তবু...যা, চলে যা তুই।' বলে বৌদি ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে খাটের উপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

শ্বশুর-শাশুড়ি ঘুমিয়েছিলেন। বৌদি অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে কাঁদল। এক অহংকারী আত্মার অপমান থেকে উত্থিত এই কান্না। ঐ নীচ ছোটজাতের লোকটি তার মনের যে তারে হাত রেখেছে, সেই তারে সে নিজে বহুবার ঝংকার দিয়েছে,—নিভৃতে তার রসাস্বাদন করেছে। কিন্তু অতি গোপনে, সংস্কার ও অহংকারের মোড়কে সাবধানে লুকিয়ে রাখা ছিল সেই তার, কেউ যে কোনোদিন তাকে ছুঁতে পারে সে কখনো কল্পনাও করেনি। ঐ নীচুজাতির লোকটি তার মনের সেই তারেই হাত রেখেছে আজ। এ রীতিমতো অপমান। অপমানের জ্বালা অশ্রু হয়ে ঝরছিল। ঐ ছোটলোকটা দোষী নিশ্চয়ই, কিন্তু তার নিজের কী দোষ নেই? তা' না হলে লোকটাকে সে কোনো শাস্তি দিল না কেন? রাজপুতানীর রক্তের ধারা কী তার শরীরে বইছে না?

সেইদিন থেকে বৌদি আরো সাবধান হয়ে গেল। একবার ধরা পড়ার পর চোর যেমন সাবধান হয়ে যায় ঠিক সেইরকম। এখন সে বিলরার সামনেও যায় না। ভোরবেলা শাশুড়িকে জাগিয়ে দেয়। তাঁরই হাতে দুধের কলসী, খোলের টুকরি পাঠিয়ে দেয়। কর্মচারী হলেও লোকটা পুরুষমানুষ। আর পুরুষ মানুষের সামনে কোনো বিধবা না যেতেও পারে। ঐ নীচ লোকটার কথাগুলো বৌদির গোপন পাপী চিন্তাস্রোতকে প্রভাবিত করছিল। বৌদি সর্বদাই দেওরের কথা চিন্তা করে। ছোটখাট

তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনা এমন রূপ নেয় যে বৌদির ভয় হয় তার দেওর তার প্রতি প্রেমাসক্ত ছিলো না তো? সরল, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র স্নেহের সম্পর্কে কামনার সূক্ষ্ম প্রলেপ দিতে আর কত দেরী হয়? আর বৌদির তৃষ্ণার্ত হৃদয় তো আজকাল ঐ কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করে। কখনো কখনো ঐ নীচু জাতের লোকটির সমাজকেও সে ঈর্ষা করে, তখনই যেন অজ্ঞাত কোনো কঠোর পুরুষ তার দেহে তীব্র কশাঘাত করে তাকে রক্তাক্ত করে দেয়। বৌদির কল্পনার রাজ্যও কণ্টকাকীর্ণ, যেখানে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

সাত

বেনারস জিলা জেলে পৌঁছেই মটরুর শ্বাসকষ্ট শুরু হল। তিন চার দিন কেউ তাতে গুরুত্ব দিল না। কিন্তু পরে যখন সে এমন কাহিল হয়ে পড়ল যে চলা ফেরা করার ক্ষমতাও রইল না, তখন তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হল। হাসপাতালে গোপীর ঠিক পাশেই তার বিছানা। ডাক্তার কোনোদিন আসেন, কোনোদিন আসেন না। কম্পাউণ্ডারই দেখাশোনা করে। সে লোকটি বড় ভালো। তার সেবা শুশ্রূষাতেই রোগীরা অনেকটা সেরে ওঠে। এখানে খাওয়া দাওয়াও বেশ ভালো। একটু দুধও পাওয়া যায়। জেলের পরিশ্রম থেকেও রেহাই হয়। এইসব সুবিধে ভোগ করার জন্যে অনেক সুস্থ কয়েদীও হাসপাতালে পড়ে থাকে। এরজন্য ডাক্তার আর জেলরক্ষী দুজনেরই হাত গরম করতে হয়। অবস্থাপন্ন কয়েদীর পক্ষেই সেটা সম্ভব। মটরু প্রায় এক সপ্তাহ নির্জীবের মতো পড়ে রইল। শুকনো কাশি, আর রোগের যন্ত্রণায় 'উঃ আঃ' শব্দ। কম্পাউণ্ডার অনেক রাত পর্যন্ত তার বুকে পিঠে ওষুধ মালিশ করে। নিজের ছুটি নিয়ে সে চিন্তিত হয় না।

কয়েকটা ইঞ্জেকশনের পর মটরু কিছুটা সুস্থ হল। এখন সে অনেকটা সময় ঘুমিয়ে কাটায়। ঘুমের মধ্যেই 'মা মা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, উঠে বসে পড়ে আর বিস্ফারিত চোখে চারিদিকে তাকায়।

এইরকমই একটাদিনে গোপী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'মায়ের কথা বড় বেশী মনে পড়ে তোমার?' 'হ্যাঁ' মটরু যেন অনেক দূরে তাকিয়ে বলল, 'সে দিনরাত আমাকে ডাকে। যতক্ষণ তার কাছে না যাচ্ছি আমার শান্তি নেই। তার জল হাওয়ায় না গিয়ে আমি সেরে উঠব না।' গোপী অবাক হয়ে বলে 'মায়ের আবার জল হাওয়া কী?' 'তুমি কোথায় থাকো?' মটরু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'মটরু সিং পালোয়ানের নাম শোনোনি? মা গঙ্গাই যে তার মা, এ কথা তো সবাই জানে। 'মটরু ওস্তাদ!'

বিস্ফারিত চোখে গোপী চেঁচিয়ে ওঠে। 'প্রণাম হই। আমি গোপী। আমার কথা তুমি তো জানবে না দাদা।' 'জানি গোপী, সব জানি। সেই কুস্তীর দিনে আমিও গিয়েছিলাম। তারপর যা ঘটেছিল সব শুনেছি। কেউ কারুর ক্ষমতা সহ্য করতে পারে না। যখন কিছুতেই পাল্লা দিতে পারে না, তখন নীচতার আশ্রয় নেয়। তোমার ভাইকে মেরে ফেলল, তোমাকে জেলে পাঠাল। আমার ব্যাপার শুনেছ বোধহয়। যখন কিছুতেই কায়দা করতে পারল না, তখন কী যে খাইয়ে দিল আমাকে, তখন থেকেই এই শ্বাসের কষ্ট। শরীরটা ভেঙে গেল দেখতেই তো পাচ্ছ।' 'হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' দুঃখিত স্বরে গোপী বলল, 'তারপর এখানে কী করে এলে দাদা?'

মটরু হাসল, 'আমার এই জীবনও জমিদারের অসহ্য হল। ডাকাতির মামলায় ফাঁসিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। এই বলে সে তার কাহিনী শোনাল। শেষে বলল, 'কী বলব ভাই, সব সহ্য হয়, মা গঙ্গার বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। ঐ জল না দেখতে পেলে আমার মনে শান্তি নেই, কোনো কাজে উৎসাহ পাই না। ঐ হাওয়া, ঐ জল, ঐ মাটি, আর কোথায় পাব বল? কতদিন প্রাণভরে জল খাইনি। তেষ্টাই মেটে না কী করি বল? তিন তিনটে বছর কেমন করে যে কাটাব।' 'আমাকে তো পাঁচ বছর কাটাতে হবে। পুরুষের পক্ষে সময় কাটানো মুশকিল নয়, কিন্তু মনে অশান্তি থাকলে সময়ও কাটতে চায় না। আমার মনে আমার বৌদির চিন্তা আর তোমার মনে মা গঙ্গার। সকলেই কোনো না কোনো দুঃখের শিকার। সুখে হোক, দুঃখে হোক, সময় তো কাটাতেই হবে। এখন আমরা দুজনেই এখানে রয়েছি, সুখ দুঃখের গল্প করে সময় কাটিয়ে দেব। শুনেছিলাম তুমি বিয়ে করেছ?' 'হ্যাঁ, তিনটে ছেলেও হয়েছে। বড় সুখে দিন কাটছিল ভাই। পঞ্চাশ-ষাট বিঘে জমিতে চাষ করি। মা গঙ্গা অনেক দিয়েছেন। কিন্তু জমিদারের সহ্য হল না। গঙ্গা মায়ের বুকে অনাচার শুরু করেছে। অন্যায় সহ্য করতে পারিনি। পুরুষ হয়ে মায়ের উপর অত্যাচার কী করে সহ্য করি বল?' 'তুমি যা করেছ সব ঠিকই করেছ। জমিদাররা এমন পাজী হয় যে চাষীদের সুখ তাদের সহ্য হয় না। তোমাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে ওরা যা খুশী তাই করবে। লোভী চাষীরা তুমি থাকতে যা করেনি, এবার ওদের দিয়ে জমিদার সব করিয়ে নেবে। তোমার কোনো সঙ্গী কী আছে, যে এসব কাজে বাধা দিতে পারে?' 'এক সম্বন্ধী আছে অবশ্য। কিন্তু তার কী এত সাহস হবে? চুপ করে থাকবে না নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে এতদিন থাকার কিছু তো ফল হবেই। দেখা যাক।' 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলে সব জেনে নিও।'

□

গোপী ও মটরুর সম্পর্ক ক্রমশঃ গভীর হল। একই রকম স্বভাব তাদের, একই দুঃখ,

জীবনের এই মিল তাদের অন্তরঙ্গ করল। পরস্পরের সাহচর্যে তাদের দিন ভালোই কাটতে লাগল। একই 'ব্যারাকে' রয়েছে তারা। কাজকর্মের ব্যাপারে কারুর কোনো নালিশ ছিল না। কাজেই জেলকর্তৃপক্ষ ঘাঁটাত না। মটরুর 'মা গঙ্গা'র কথা সবাই জেনে গিয়েছে। সকলেই তাকে খুব ধার্মিক মনে করে। দেখা হলে 'জয় মা গঙ্গা' ধ্বনি তোলে। জেলের চার দেয়ালের ভেতরেই একটা জগৎ তৈরি হল। হাসিঠাট্টা, লড়াই-ঝগড়া, ঈর্ষা দ্বেষ, হাসি-কান্না সবই সেখানে বাইরের জগতের মতোই চলতে থাকে। কে আর সেখানে সেখানকার সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায়? সুখে-দুঃখে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার মধ্যেই তো মানুষ প্রকৃত আনন্দ লাভ করে।

মটরু আর গোপী এখন জেলের বাইরেও একসঙ্গে থাকার কথা বলে। দুজনে এত ঘনিষ্ঠ যে পরস্পরকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারে না। মটরু বলে, 'জেল থেকে বেরিয়ে তুমি আমার কাছে চলে এস। মা গঙ্গার জল, হাওয়া আর মাটির গুণ যদি বুঝতে পার, আমি তাড়িয়ে দিলেও তুমি ওখানেই থেকে যেতে চাইবে। তোমার মতো একজন সঙ্গীর বিশেষ দরকার। জমিদার বড় বেশী জোর জবরদস্তি করছে। আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে আরো কী করছে কে জানে। আমি ফিরলে আবার আমার সঙ্গে লড়াই শুরু হবে। গ্রামের চাষীদের মধ্যে যদি ভাঙন না ধরে তারাও আমার সঙ্গে থাকবে। মা গঙ্গার বাটোয়ারা পছন্দ নয় আমার। ভাগ-বাটোয়ারা করবেই বা কী করে? মা গঙ্গা প্রতি বছর সব ভাসিয়ে একাকার করে দেন। কোনো চিহ্ন কোথাও থাকে না। আবার মা জমি ফেলে রেখে যান, তখন যার ইচ্ছে সেখানে চাষ কর। জমির কোনো কমতি নেই। সকলের সমান অধিকার। জমিদার সেখানেও নিজের জমিদারী কায়েম করে 'কর' আদায় করতে চায়। এটাই আমার ভালো লাগছে না। মা গঙ্গা কী কারুর জমিদারী হতে পারে গোপী?' 'না দাদা, এ ঘোরতর অন্যায়। ওরা এরপরে বলবে গঙ্গার জলও তাদের সম্পত্তি, যে এই জল খাবে, এখানে স্নান করবে তাকে কর দিতে হবে।' 'হ্যাঁ, এমন কথাও শুনেছি। গঙ্গার ঘাট থেকেও পয়সা লুটতে চায়। বলে, ঘাট তার জমিতে, সেখান থেকে পারাপারের পয়সায় তাকেও ভাগ দিতে হবে। আমি যতদিন ছিলাম কারুর স্পর্দ্ধা ছিল না যে এমন কাজ করে। এখন আমি নেই, কী জানি কী হচ্ছে সেখানে। ওখানে একটা দল গঠন করে এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। তুমি যদি সঙ্গে থাকো, আমার ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে যাবে ভাই।' 'আমিও তো তাই চাই। কিন্তু তুমি তো জানো বাড়িতে আমি একা। বাবা বাতে পঙ্গু। বুড়ি মা আর বিধবা বৌদিরও আমিই ভরসা। বাড়ি ছেড়ে কী করে আসি বল? হ্যাঁ, তোমার যদি পঞ্চাশ বা একশো লাঠিয়ালের দরকার হয় তো নিশ্চয়ই সাহায্য করব। খবর পৌঁছতে যা দেরী। এমনিই দুচারদিন তোমার কাছে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসব। বছরে বার দুয়েক তো যেতেই পারি। তুমিও এসো আমার কাছে। খবর দেওয়া-নেওয়া তো হবেই।'

মটরু উদাস হয়ে গেল। সে সত্যিই গোপীকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু গোপীর বাড়ির যখন এইরকম পরিস্থিতি, সে তাকে জোর করে কেমন করে? সে বলল, 'আমাদের বন্ধুত্ব যেন অটুট থাকে, সেই চেষ্টাই করব আমরা।'

□

মটরু বা গোপীর সঙ্গে অনেকদিন কেউ দেখা করতে আসেনি। দুজনেই খুব চিন্তিত। সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে বেনারসে আসা চাষীদের পক্ষে সহজ কাজ নয়। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার পর সারাজীবনে একবার হয়ত তারা কাশী প্রয়াগ তীর্থ করতে বেরোয়। যখন খুশী বেড়াতে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্যও নেই তাদের। অবসরই বা কোথায়? একদিন কাজ বন্ধ হলেই চিন্তা হয় 'খাবো কী?' খাওয়ার চিন্তাই হোক, অথবা সঞ্চয়ের কিংবা ক্ষেতের পরিধি বাড়ানোর লালসা যাই হোক না কেন, সহজে মুক্তি নেই তাদের।

গোপীর শ্বশুর প্রথম দিকে দু তিন মাস অন্তর একবার ঘুরে যেতেন। কিন্তু একটি মেয়ের বৈধব্য ও অন্যটির মৃত্যুর পর কোনো ব্যাপারেই তাঁর আর আগ্রহ ছিল না। তিনি ছাড়া আর কেই বা আসবে?

মটরুর শ্বশুর অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ। জীবনে কখনো তাঁকে নিজের গ্রামের বাইরে যেতে হয়নি। আশা ছিল শ্যালক আসতে পারে। কিন্তু তারই বা এমন কী কাজ পড়ে গেল যে একবার খবর নিতেও এল না।

সামনের মাসে চন্দ্রগ্রহণ। এই উপলক্ষে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখা করতে আসেব। গ্রহণের দিন কাশীতে স্নান করা পুণ্যের কাজ। একই ঢিলে দুই পাখি মরবে।

চন্দ্রগ্রহণের আগের দিন রবিবার। সকাল থেকেই সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ভিড়। যেসব কয়েদীর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে, জেলরক্ষী তাদের নাম ধরে ডাকছে, ফটকের কাছে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছে। যার নাম ডাকা হচ্ছে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যার নাম ডাকা হল না, তার মুখে বিষাদের ছায়া। ফটকের দিক থেকে উল্লাস ধ্বনি ভেসে আসছে।

মটরু ও গোপী উদাস মুখে ব্যারাকের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের আশা ছিল আজ কেউ না কেউ তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবে; কিন্তু যখন কেউ তাদের নাম ধরে ডাকল না, আর নাম ডাকাও শেষ হয়ে গেল তখন তাদের দুজনের চোখের উজ্জ্বলতা নিভে গিয়ে বিষাদের ছায়া নামল। 'দেখো না আজও কেউ এল না।' কাঁদো কাঁদো গলায় গোপী বলল। 'মা গঙ্গার যা মর্জি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মটরু বলে। ওয়ার্ডার তখনই ছুটে এসে বলল, 'চলো চলো গঙ্গা পালোয়ান, তোমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে। তাড়াতাড়ি চলো। পনেরো মিনিট তো এমনিই কেটে

গেছে।' মটরুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গোপী জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাছে কেউ আসেনি, ওয়ার্ডার সাহেব?' 'না ভাই, এলে কী আমি বলতাম না?' ওয়ার্ডার উত্তর দিল, 'গঙ্গা পালোয়ানের কাছে এসেছে। আমি তো ভেবেছিলাম মা গঙ্গা ছাড়া ওর আর কেউ নেই, আজ বুঝলাম...।' 'আমার সঙ্গে গোপীও যাবে,' মটরু উদাস হয়ে বলল, 'ও আমার আত্মীয় হয়।' 'তা' কেমন করে হবে? জেলর সাহেবের হুকুম ছাড়া তা হতে পারে না। চলো, দেরী করে সময় নষ্ট কোরোনা।' ওয়ার্ডার্রি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করল। 'ওয়ার্ডার্রি সাহেব, এতদিন পরে কেউ দেখা করতে এসেছে। কে আর রোজ রোজ আসছে আমার কাছে। এইটুকু দয়া কর। আমাদের তো তুমিই জেলর।' মটরু মিনতি করে। 'মুশকিল আছে পালোয়ানজী, তা না হলে তোমার কথা রাখতাম। চলো তাড়াতাড়ি, দেখা করার জন্যে কেউ অপেক্ষা করছে।' ওয়ার্ডার্রি তাড়া দিল। 'যাও ভাই, দেখা করে এস। আমার দিকের খবরা খবরও জিজ্ঞেস করে নিও। আমার জন্যে কেন শুধু শুধু...' 'তুমি চুপ করো।' মটরু ধমক দিল, 'আমি তো জানি ওয়ার্ডার্রি সাহেব চাইলে সবকিছু করতে পারেন।' মটরু করুণ চোখে তাকাল, 'ওয়ার্ডার্রি সাহেব, এতদিন হয়ে গেল কখনো কিছু চাইনি। আজ আমার এইটুকু কথা রাখুন। মা গঙ্গার আশীর্বাদে আপনার ছেলে হবে।'

ওয়ার্ডার্রিটি নিঃসন্তান, কয়েদীরা পুত্রলাভের দোহাই দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেয়। এটাই তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তার সর্বদাই মনে হত কী জানি কার মুখ দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরে বাণী শোনা যাবে। সে ধর্মসংকটে পড়ে যায়। 'আচ্ছা দেখছি। তুমি যাও তো। আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে দেখছি।' 'না ওয়ার্ডার্রি সাহেব, পাকা কথা বলুন। তা' না হলে আমিও যাবনা। এখন পর্যন্ত আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি, তাতে কী আমি মরে গেছি? মা গঙ্গা...' 'আচ্ছা ভাই আচ্ছা। তুমি চলো। আমি সুযোগ বুঝে গোপীকেও নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের জন্যে আমার চাকরিটা একদিন যাবে।' বলে সে এগিয়ে গেল।

মটরু শ্বশুরের পায়ের ধূলো নিল। সম্বন্ধী প্রণাম করতেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারা সবেমাত্র বসে খবরের আদান প্রদান শুরু করেছে, এমন সময় গোপীও ধীরে ধীরে সেখানে এসে বসল। মটরু পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হল হরদিয়ার গোপী। সেই গোপী-মাণিক! নাম শুনেছ না?' 'হ্যাঁ হ্যাঁ', দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল। 'ও এখানে আমার সঙ্গেই আছে। এর বাড়ির কোনো খবর জানো?' মটরু আগে বন্ধুর বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করল। 'সব নিশ্চয়ই ঠিক আছে। তেমন কিছু ঘটে থাকলে কানে আসত।' বুড়ো শ্বশুর জবাব দিল, 'এ ভালোই হয়েছে, একই জায়গার দুজনে একসঙ্গে আছ। বিদেশে নিজের দেশের লোকের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নয়।

'আচ্ছা পূজন', মটরু শ্যালককে সম্বোধন করে বলল, 'এবার চরের খবর শোনাও। মা গঙ্গা কী তেমনি আছেন, না কিছু এদিক ওদিক সরেছেন?' 'এ বছর নদী অনেক দূরে

সরে গেছে দাদা। যেখানে আমাদের ঝুপড়ি ছিল, সেখান থেকে আরো আধ ক্রোশ দূরে এগিয়ে গেছে। এবার এত ভালো মাটি বেরিয়েছে, তুমি দেখলে ভারী খুশী হতে। এ বছর চাষ করলে খুব ভালো ফসল হত। আমার তো হাত কামড়ানোর অবস্থা। জমিদার পশ্চিমের দিকে কিছুটা চাষ আবাদ করেছে, তার ফসল দেখলে আমার বুকে আগুন ধরে যায়। 'আর চাষীরাও...' 'না দাদা, জমিদার তো অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তোমার ভয়ে ওরা কেউ রাজী হয়নি। জমিদারের ফসলও কী আমি বেচতে দেব নাকী? দেখো না কী হয়। চাষীদের অবস্থা খুব খারাপ। তুমি জেলে আসার পরে অনেক ঝামেলা হয়েছে। পুলিশ কী কম কষ্ট দিয়েছে? তুমি ফিরে এস, তারপর দেখব, জমিদার এদিকে পা রাখার সাহস পায় কী করে। আমরা সবাই তৈরি দাদা।' 'সাবাস!' মটরু পূজনের পিঠ চাপড়ে দেয়, 'তোর তো খুব সাহস দেখছি। আমি তো তোকে ভীতু ভাবতাম।' 'মা গঙ্গার জল খেয়ে আর তার মাটি সারা গায়ে মেখে কী কেউ ভীতু থাকে দাদা? তুমি এসে দেখো। এক দানা ফসলও যদি জমিদারের ঘরে উঠেছে তো আমি গঙ্গায় ডুবে মরব।' 'আচ্ছা আচ্ছা। অন্য সব খবর বল। এই ঠাণ্ডায় বাবাকে নিয়ে এলি কেন?' মটরু খুশী হয়ে বলল। 'মা মানলেন না। গ্রহণের স্নানও এই সুযোগে হয়ে যাবে। বিশ্বনাথের দর্শনও হবে। এই জীবনে একটা তীর্থ তো হয়ে গেল। এবার তোমার কথা বল। খুব রোগা হয়ে গেছো।' 'ও কিছু না। মা গঙ্গার কৃপায় ভালোই আছি। তুমি সাবধানে থেকো। চাষীদের যেন জমিদারের ফাঁদে পা রাখতে দিও না। আমি ফিরে এসে আবার সব ভার নেব। এবার তোমাদের ওদিকে ফসল কেমন হয়েছে? আখ কত লাগিয়েছ?' 'একবার বৃষ্টি হয়ে গেলে ভালোই ফসল হবে। চারা বেরিয়েছে অনেক, কিন্তু রামজী যতক্ষণ না জল ঢালছেন, ততক্ষণ মানুষের ঢালা জলে তো কাজ হয় না। দু বিঘা জমিতে আখ লাগিয়েছি। ভালো ফলেছে। চিন্তা কোরোনা। নদীর চরের ফসল এখনও কিছু রয়ে গেছে।' 'আর বাবুরা সব কেমন আছেন?' মটরু ছেলেদের কথা জিজ্ঞেস করল। 'বড়টাকে স্কুলে ভর্তি করেছি, ওকে পড়াতেই হবে। বাড়িতে একজন অন্তত লেখাপড়া জানা লোক থাকা উচিত। পাটোয়ারী-জমিদার যেসব আইন কানুনের প্যাঁচ মারে সেইসব বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তার উচিত জবাব দেওয়া যায় না। নিরক্ষর গাঁইয়া প্রতি পদেই ওরা আমাদের বোকা বানায়। আর আমরাও অন্ধের মতো দিশাহারা ওদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। চরের জমির ব্যাপারে ওরা নতুন আইন বানিয়েছে। বলছে জঙ্গল যার, চরের জমিও তার। গায়ের জোরে ওরা জঙ্গলের গাছ কেটে বিক্রী করে। জঙ্গল কী সতিই ওদের নাকী? জিজ্ঞেস করলে বলে 'তোরা আইনের কী বুঝিস? আইনের জ্ঞান দিতে আসে। আমরাও দেখব ফসল কেটে ঘরে নেয় কী করে। কোনোদিন লাঙ্গলে হাত রাখল না, মশক ছুঁলো না, তারা কেন ফসল পাবে? যারা লাঙ্গল চালিয়েছে, জমিতে খেটেছে, তাদেরই তো পাওয়া উচিত। আর দাদা, আমরা ঠিক

করেছি ঐ ফসল তাদের ঘরেই পৌঁছে দেব।' 'ঠিক কথা, ঠিক কথা। হ্যাঁরে, খাবার জিনিস কিছু এনেছিস? কতদিন ছাতু খাইনি, খেতে বড় ইচ্ছে করে।' মটরু হেসে বলে। 'ছাতু এনেছি দাদা। ছাতু, নতুন গুড় আর চিঁড়েও আছে। ওখানে ফটকের কাছে রেখে নিয়েছে। বলেছে, তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। তুমি পেয়ে যাবে তো দাদা?' পূজন নিজের সন্দেহ দূর করতে চাইল। ফটকের কাছে জমা করতে ইচ্ছে ছিল না তার। সে নিজের হাতেই মটরুকে দিতে চেয়েছিল। ওরা অনেক নিয়ম কানুনের কথা বলায় বাধ্য হয়েই রেখে এসেছে। 'হ্যাঁ, অর্দ্ধেকটা তো পেয়েই যাব।' 'আর বাকীটা?' পূজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'বাকীটা নিয়ম কানুনের পেটে যাবে।' বলে মটরু জোরে হেসে উঠল। বুড়ো শ্বশুর আর পূজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মটরু বলল, 'এবার যখন আসবি, গোপীর বাড়ির খবর আনতে ভুলিস না।' 'যদি আসি, নিশ্চয়ই খবর আনব। কিন্তু দাদা, আর বোধহয় আসা হবে না। সময় পাইনা একটুও। তোমরা তো বেশ ভালোই আছ এখানে।' পূজন নিজের অসুবিধের কথা জানায়। 'তবু চেষ্টা করিস। মাঝে মাঝে খবর পেলে অত চিন্তা হয় না।'

সাক্ষাতের সময় শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজল। যারা হাসিমুখে ঢুকেছিল, তারা মলিন মুখে বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কেউ চোখ মুছছে, কেউ নাক রগড়াচ্ছে, কেউ একেবারে চুপ মেরে গেছে। যেতে যেতে বার বার পিছু ফিরে তারা তাদের আপন জনের দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখছিল।

আট

দু বছর কেটে গেছে। গোপীর বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। গোপীর জেল থেকে ফেরার আরো দু বছর বাকী একথা জেনেও তারা নিরস্ত হয় না, সত্যাগ্রহীর মতো ধরণা দিয়ে বসে থাকে। পঙ্গু বাপের কাছে গিয়ে মিনতি করে। বলে, 'পাকা দেখা সেরে রাখুন, গোপী ফিরে এলেই বিয়ে হবে।'

এইসব দিনে মা ভারী খুশী। তাঁর চোখ উজ্জ্বল, মুখে খুশীর আভা। ছুটোছুটি করে তিনি অতিথিদের আপ্যায়ণ করেন। পুত্রবধূকে এটা ওটা করার নির্দেশ দেন। সেইসব দিনে বৌদি বড় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সব কাজেই বিরক্তি। মুখে চাপা রাগ, চোখে আগুনের ফুলকি ঝরছে। ভালো করে কথা বলে না। বাসন পত্র জোরে জোরে এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলে। কখনো গজ গজ করে, 'এত তাড়ার কী আছে? আগে ফিরে তো আসুক।' শাশুড়ি জবাব দেন, 'ওর আসা না আসায় কী এসে যায়? বিয়ে তো করতেই হবে। ঠিক করা থাকলে, একদিন হয়েই যাবে। বুড়ো আর কদিন বাঁচবে

কে জানে। সে থাকতে থাকতে বিয়েটা তো ঠিক হয়ে থাক।'

বৌদি শোনে, আর তার মনে একটা তোলপাড় শুরু হয়। অসহায় ক্রোধে সারা শরীর কেঁপে ওঠে। জোরে জোরে পা ফেলে চলে, পৃথিবীটা ভেঙে চুরমার করতে চায় যেন। ঠোঁট কামড়ে ধরে, নাকের পাটা ফুলে ওঠে,—বিড় বিড় করে পাগলের মতো কত কী যে বলে।

শাশুড়ি এইসব দেখে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'তোর এসব লক্ষণ ভালো নয় বৌ। অত মেজাজ দেখাস না আমাকে। যার যা অদৃষ্টে আছে, তাকে তা ভুগতেই হবে। সে তুমি কেঁদেই ভোগো আর হেসেই ভোগো,—ভোগান্তি থেকে নিস্তার নেই। যতদিন ভালো হয়ে থাকবি, দুবেলা দু মুঠো জুটবে। তা না হলে কোথাও ঠাঁই হবে না। সবাই তোর মুখে থুতু ফেলবে।' 'কে থুতু ফেলবে?' বৌদি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, 'আমার বাবা, ভাই সবাই কী মরে গেছে? ওরা নিয়ে যেতে চেয়েছিল, যাইনি। তার ফল পাচ্ছি এখন। যেখানে গতর খাটাব, সেখানেই দুমুঠো জুটবে। যাদের গতর ভেঙেছে, কাঁদতে হয়, তারা কাঁদুক।'

বৌ-এর ঠেস দিয়ে বলা কথায় শাশুড়ি রেগে আগুন হলেন, 'ওঃ, দু চারদিন একটু হাত পা নেড়েছিস বলে এত মেজাজ দেখাচ্ছিস কাকে? আমাকে কী ভেবেছিস তুই? তোর ভরসায় আমি অন্তত বেঁচে নেই। আমার সঙ্গে মুখ সামলে কথা বলবি। আমার হাত দুটো এখনও আস্তই আছে। বাপ-ভাইয়ের বড়াই করছিস যে, ওখানে গিয়েও দেখে আয়, যার কপাল পুড়েছে, তার কোথাও ঠাঁই হয় না। তুই কতটুকু জানিস? কত ধানে কত চাল যেদিন জানবি, আমি কী বলতে চাইছি সেদিন বুঝতে পারবি। বুড়োটাকে রোগে ধরেছে, তা না হলে মুখ থেকে একটাও কী শব্দ বার করতে পারতিস তুই?'

এই বাক বিতণ্ডার ফলে শাশুড়ি কিংবা বৌদি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে কাঁদতে বসে। বুড়ো শুয়ে শুয়ে শোনে, আর বিড় বিড় করে, 'হে ভগবান, এবার আমাকে তুলে নাও। রোজ রোজ এই ঝগড়ঝাটি আর সহ্য হয় না।'

পাড়া প্রতিবেশীরাও আর এই বাড়ির ধার ঘেঁষে না। এই কলহ প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজ রোজ কে আর কার খবর নেয়। মহিলাদের অবশ্য কৌতূহল হয়। কান্না শুনে তারা ছুটে আসে। বৌদিকে বোঝায়, 'তোমার চুপ করে থাকা উচিত। শাশুড়িরা অমন বৌকে বকাবকি করেই থাকে। শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করেই তো জীবন কাটাতে হবে তোমায়। এত ঝগড়া কর কেন? বাপ-ভাই শিশুকালের সঙ্গী, চিরকালের নয়। আর কপাল পুড়লে নিজের লোকও পর হয়ে যায়।' শাশুড়ি নিরীহ কণ্ঠে বলেন, 'জিজ্ঞেস করত কী বলেছি আমি ওকে কীই বা বলতে পারি। জোয়ান ছেলেটা চলে গেল। আরেকটা জেল খাটছে। উনি তো কত দিন হল বিছানা নিয়েছেন। আমার কী আর কোনো হুঁস আছে? মরণও তো হয় না। পাপের ভোগ

কপালে আছে, মরে হাড় জুড়োব কী করে বল?' শাশুড়ি বৌদিকে কথা শোনাতে ছাড়েন না, কিন্তু একথাও জানেন যে সে সত্যি সত্যিই বাপের বাড়িতে চলে গেলে মুস্কীল হবে। ঘর-সংসার সামলাবে কে? তাঁর পক্ষে সব কাজ সামলানো অসম্ভব। কাজেই ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় বলেন, 'কী এমন কাজ। তিনটি তো প্রাণী। রেঁধে, বেড়ে, খাওয়ানো, এই তো! আমিও যতটা পারি সাহায্য করি। ওকেই জিজ্ঞেস করো, এইটুকুও যদি না পারে তাহলে কী করে চলবে? রাজা মহারাজা তো নই যে বসে বসে খাব আর খাওয়াবো। ওর এমন করাটা কী ভালো হচ্ছে?', 'না বৌ, না। একটু বোঝবার চেষ্টা কর। শাশুড়ি তোর ভালোর জন্যেই বলছেন। কুঁড়েমী করার অভ্যেস ভালো নয়। বিধবার সম্মান তার কাজের জন্যে, রূপের জন্যে নয়।' মহিলাটি আরও বলে, 'ভগবান না করুন যদি তেমন দিন আসে, গতর খাটিয়েও তো জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবি।'

বৌদির কানে কেউ যেন গরম সীসে ঢেলে দেয়। সারা শরীর জ্বলে ওঠে। কিন্তু সে চুপ করে থাকে। বাইরের লোকের সামনে মুখ খোলার দুঃসাহস নেই তার। সে চুপচাপ বসে চোখের জল ফেলে। মাঝে মাঝেই বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার ভয় দেখালেও সে আসলে কোথাও যেতে চায় না। কী জানি কী করে তার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে দেওর ফিরে এলেই সব দুঃখের শেষ হবে।

শাশুড়ি বৌ-এর ঝগড়া হয়, আবার মিটমাট হয়ে যায়। ঝগড়ার দিনে শাশুড়ি খেতে না চাইলে বৌদি ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ায়, আবার বৌদি যেদিন খেতে না চায় শাশুড়ি সাধ্যসাধনা করেন।

শ্বশুরের সেবা যত্নের প্রয়োজন, উনি তা পেয়ে যান। বৌদি সেবাযত্নে শ্বশুরকে খুশী রাখতে চায় শ্বশুর তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। এত সেবাযত্ন তার স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তিনি সর্বদাই পুত্রবধূর পক্ষ সমর্থন করতেন। গোপীর জন্যে আসা বৈবাহিক সম্বন্ধের ব্যাপারেও তিনি বৌদির মতামত জানতে চাইতেন। এইসব সময়ে বৌদি বেশ জোর দিয়ে বলে, 'সম্বন্ধ তো ভালোই, কিন্তু ওরা ঠিক আমাদের সমান স্তরের নয়। লোকে বলবে, প্রথম বিয়েটা যত ভালো ছিল, দ্বিতীয়টা তেমন হল না।'

বুড়ো গর্বিত হন। বলেন, 'তুই ঠিক বলেছিস বৌ। একশোটা সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়ে আমি ঐ সম্বন্ধ স্থির করেছিলাম। কী আর বলব। দেখতে দেখতে সব বদলে গেল। সংসার ছারখার হয়ে গেছে। একটা তো বুক ভেঙে দিয়ে চলে গেল। অন্যটা জেলে পড়ে আছে। আমার রাম-লক্ষ্মণ, সীতা-উর্মিলার জুটিগুলো ভেঙে গেল। আমি পঙ্গু হয়ে গেলাম।' বলতে বলতে তাঁর চোখ অশ্রু সজল হয়, 'আমার সুদিন শেষ হয়ে গেছে। চাষবাসের অবস্থাও ভালো নয়। কোন গণ্যমান্য লোক আসবে আমার কাছে মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে?' 'দুঃখ করবেন না বাবা, কিচ্ছু নষ্ট হয়নি। গোপী এসে সব সামলে নেবে। সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে। তখন দেখবেন

কত লোক এসে হাত জোড় করে বসে থাকবে। একটু ধৈর্য ধরুন বাবা! এত তাড়ার কী আছে? সে আগে জেল থেকে ফিরে তো আসুক।'

'হ্যাঁ বৌ, এইসব ভেবে আমিও কাউকে পাকা কথা দিচ্ছি না। কিন্তু তোর শাশুড়ি তো আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বলছে, দোজবরে ছেলে, এখন অত বাছবিচারে কাজ নেই। তার যে কিসের এত তাড়া তা বুঝছি না। আমরা কী এতই নীচে নেমে গেছি যে কেউ আর সম্বন্ধ নিয়ে আসবেই না আমাদের কাছে? কিছু না থাক, বংশ মর্যাদা তো আছে। না না, সে যাই বলুক, যার তার সঙ্গে মোটেই সম্বন্ধ করব না।' শ্বশুর বেশ জেদের সঙ্গেই বলেন।

□

সেই সময় একদিন সন্ধ্যেবেলায় এক অচেনা আগন্তুক গ্রামের পশ্চিম সীমায় পুকুর ঘাটে এসে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল, 'গোপী সিং-এর বাড়ি কোন দিকে বলতে পারেন?'

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে। চারপাশে জঙ্গল থাকায় সেখানে অন্ধকার আরো গাঢ়। ক্ষেত ফেরৎ চাষীরা এখানে এসে স্নান সেরে ঘাটের পৈঠায় দু-দণ্ড বসে একটু গল্প গুজব করে। কারুর গায়ে ভিজে কাপড়, কেউ আবার গামছা পরে কাপড়টি শুকানোর জন্যে মেলে দিয়েছে, কেউ এখনও পুকুর ছেড়ে ওঠেনি। তাদের কাশি, গলা ঝাড়া, রাম নাম উচ্চারণ ও ঘাটের সিঁড়িতে জলের তরঙ্গ -ভঙ্গের শব্দে স্থানটি মুখরিত। জঙ্গলে পাখিদের কলরব। হাওয়া স্তব্ধ হয়ে আছে। পুকুর ঘাট তবু বেশ ঠাণ্ডা। প্রশ্ন শুনে সকলেই ফিরে তাকাল। পুকুরে যারা আছে তারাও গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। একজন জিজ্ঞেসও করল, লোকটা কে, কার বাড়ি জানতে চাইছে।

আগন্তুকের পরণে লুঙ্গি। বলিষ্ঠ শরীর। উন্মুক্ত রোমশ বক্ষদেশ। গলায় কালো পুঁতির তিন লহরী মালা। দাড়ি গোঁফে মুখ প্রায় ঢাকা পড়েছে। চোখে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। চুলগুলি জটার মতো কাঁধের উপরে লুটিয়ে আছে।

গোপীর বাড়ির পথ বুঝিয়ে দিয়ে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'কাশীধাম থেকে আসছি। সেখানে জেলে ছিলাম।' আগন্তুকটি চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই আরেকজন প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ ভাই, শুনেছি গোপীও কাশীর জেলে আছে। তোমার সঙ্গে সেখানে তার দেখা হয়েছে কী?' আগন্তুক দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'আমরা একসঙ্গেই ছিলাম। তার খবরই দিতে এসেছি।' শুনে সকলেই উঠে এসে তার চারপাশে ভীড় করল। যারা পুকুরে ছিল, তারাও উঠে ভিজে গায়েই এসে

দাঁড়াল। একই সঙ্গে অনেকে উৎসুক প্রশ্ন করল, 'গোপী কেমন আছে ভাই? সে ভালো আছে তো?' 'হ্যাঁ, ভালো আছে। চিন্তার কিছু নেই।' এই বলে আগন্তুকটি এগিয়ে গেল। সকলেই তার পিছু নিল। যারা কাপড় শুকোতে দিয়েছিল, তারা সেগুলো উঠিয়ে নিল। একজন দৌড়ে গোপীর বাড়িতে খবর দিতে গেল। 'ওর বুকে যে চোট লেগেছিল, সেরে গেছে?' 'হ্যাঁ' 'গ্রামের আরো কয়েকজন ওর সঙ্গে জেলে গিয়েছিল। তাদের খবর জানো?' 'ওরা কেউ ওখানে নেই। হয়ত সেণ্ট্রাল জেলে আছে।' 'তোমরা দুজনে একসঙ্গে ছিলে?' 'হ্যাঁ' 'তোমার কেন জেল হয়েছিল ভাই? তুমি কোথাকার লোক?' 'চরের জমির ব্যাপারে জমিদারের সঙ্গে লেগেছিল। তোমরা শুনে থাকবে। বছর তিনেক আগের কথা। মটরু পালোয়ানের নাম শুনেছ?' 'মটরু পালোয়ান!' সকলে সবিস্ময়ে বলে ওঠে। 'জয় গঙ্গাজী!' 'জয় গঙ্গাজী!' 'সব জানি ভাই। সেই ঘটনার খবর তো অনেকদূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তোমার কত বছরের সাজা হয়েছিল?' 'তিন বছরের' 'গোপীর পাঁচ বছরের সাজা হয়েছে না? সে কবে ছাড়া পাবে? বেচারার ঘর সংসার সব ছারখার হয়ে গেছে। বৌটাও মরে গেল।' 'কী? চকিত বিস্ময়ে মটরু প্রশ্ন করে। 'তোমরা জানো না? গোপীর বৌ তো একবছরের মধ্যেই দেহ রেখেছে। গোপীকে কেউ খবর দেয়নি?' 'তাকে খবর দিলে সে কী আমাকে জানাত না? বড়ই খারাপ খবর শোনালে ভাই তোমরা।' 'এর উপর কী কারুর হাত আছে? ভাই নেই, বৌ মরে গেল, বাপ বাতে পঙ্গু, মরার আগে সে রোগ সারবে বলে মনে হয় না। বিধবা বৌদি চোখের জল ফেলছে। কী দিন ছিল ওদের, আর আজ এই অবস্থা। মনে পড়লে বুক ফাটে।...এই যে, এদিক দিয়ে এসো।'

দূর থেকেই কান্না শোনা গেল। খবর পেয়েই মা ও বৌদি কাঁদতে শুরু করেছে। পুরানো দিনের কথা বলে বিলাপ করে কাঁদছে তারা। পাড়ার মহিলারা জমা হয়েছে। তারা চুপ করানোর চেষ্টা করছে। বাপ কোনমতে উঠে দেওয়ালে ভর দিয়ে বসেছেন। তাঁর মন নীরবেই কাঁদছে। একজন একটি চৌকী এনে বুড়োর খাটিয়ার কাছে রেখে গেল। একজন প্রদীপ জ্বালিয়ে কুলুঙ্গীতে রাখল।

মটরু বুড়োর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে তিনি খুশী হয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আমার গোপী কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

গোপীর খবর শুনতে অনেক লোক এসে জুটেছে। মটরু যেন গো-হত্যার পাপ করে এসেছে, এই রকম তার মুখের অবস্থা। বাকী লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। বুড়োকেও একজন সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'কেঁদোনা কাকা, তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। অনেক দিন তো কাটিয়ে দিয়েছ। আর অল্প দিন বাকী আছে। তাও কেটে যাবে। যে ঈশ্বর দুঃখ দিয়েছেন, তিনিই আবার সুখও দেবেন।' 'জলটল খাবে তো ভাই?' একজন মটরুকে প্রশ্ন করল। 'আরে ওকে জিজ্ঞেস করছ কেন? ঘটি-কলসি নিয়ে এসো। ক্লান্ত হয়ে এসেছে।' একবুড়ো বলল,

'হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও বাছা। আজ রাতটা এখানেই থেকে যাও। এই বেচারীরা মনে একটু শান্তি পাবে।'

মটরু চুপচাপ বসে ছিল। অন্য ধারণা নিয়ে সে এখানে এসেছিল। সে কী জানত যে এখানে এসে এদের সুপ্ত, গোপন ব্যথাগুলিকে সে জাগিয়ে দেবে?

ধীরে ধীরে ব্যথার জোয়ার শান্ত হল। এক এক করে প্রতিবেশীরাও বিদায় নিলো। বুড়ো বললেন, 'নাও, এবার হাত মুখ ধুয়ে নাও। আদর-যত্ন করার কেউ তো এখানে নেই, কিছু মনে কোরোনা বাছা। তোমার প্রশংসা অনেক শুনেছি। গোপীর খবর দিতে এসেছ,—মনে বড় শান্তি পেলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

মটরু হাত মুখ ধুয়ে এসে বসতে মা অন্দর থেকে দই আর গুড়ের শরবত এনে সামনে রাখলেন। মটরু প্রণাম করল। বুড়ি চোখের জল মুছে সেখানেই দাঁড়াল।

শরবত শেষ করে মটরু যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, 'চিন্তার কিছু নেই মা, গোপী খুব ভালো আছে। আমাদের খাওয়া বসা শোওয়া সব একসঙ্গেই ছিল। তার একটাই দুঃখ ছিল, বাড়ির কোনো খবর পেত না।

'কী করব বল? দেখতেই তো পাচ্ছ আসা-যাওয়া করার মতো কেউ নেই। আগে ওর শ্বশুর আর সম্বন্ধী মাঝে মাঝে দেখা করতে যেত, এখন ওরাও যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের সঙ্গে ওদের আর সম্পর্কই বা কিসের?' বলে বুড়ি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

'চিঠি পত্র তো লিখতে পারেন।'

'সেখানে যে চিঠি লেখা যায় তাও তো জানিনা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন যাবেনা। মাসে একটা চিঠি সকলেই পায়।'

'কালই আমি চিঠি লিখে পাঠাব।'

'এখন থাক। আমিই খবর পাঠাব। আপনাদের আর চিন্তা করতে হবে না। শুনলাম ওর স্ত্রীও মারা গেছে। ও তো কোনো খবরই পায়নি।'

'আমিই বারণ করেছিলাম। দুঃখের খবর দেবই বা কী করে? ওখানে তো সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ নেই।'

'আহা, বৌ মরেছে তো কী হয়েছে?' বুড়ো বলে উঠলেন, 'ছাড়া পেয়ে আসুক না, এখানে রোজ দুবেলা কত লোক এসে সাধাসাধি করছে। এবার এমন বৌ নিয়ে আসব...'

'না কাকা, গোপীর বিয়ে এবার আমি দেব। আপনি অসুস্থ মানুষ, বিশ্রাম নেবেন। সব ব্যবস্থা আমি করব। ও আগে আসুক না। আপনি কী জানেন যে গোপীকে আমি নিজের ছোট ভাই বলে মনে করি। আর কাকা, সেও আমাকে বড় মান্য করে। তার বৌদি ভালো আছে তো? বৌদির কথা খুব বলে।'

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বৌদি সব শুনছিল, সে কথা কেউ বুঝতে পারেনি।

বুড়ি বলল, 'তার আর ভালো-মন্দ কী বাবা? কপাল পুড়েছে,—জীবনে আর বাকী কী রইল? যতদিন বাঁচবে, এখানে পড়ে থাকবে। তার বাপ ভাই তো কোনো খবরও নেয় না।' 'বৌদিকে নিয়ে গোপীর খুব চিন্তা। বেচারীর মুখে দিনরাত বৌদি আর বৌদি। দুজনে ভারী ভাব, তাই না?' মটরু জিজ্ঞেস করল।

'বৌটা বড় ভালো মানুষ।' বুড়ো বলে উঠল, 'তার সেবাতেই তো টিকে আছি। ওর খালি সিঁথি দেখে বুক ভেঙে যায়। এই কচি বয়সে এমন বিপত্তি এল বেচারীর জীবনে। তবু বলছি, আমি থাকতে তাকে কোনো দুঃখ পেতে দের না। আমার বড়বৌ একদিন এই সংসারের কর্ত্রী হবে। সে দেবী।'

বুড়ি শুনছিল, আর মনে মনে জ্বলে উঠছিল। আর যখন সহ্য হলনা, তখন বলে উঠল, 'রান্না হয়ে গেছে। এখন খাবে তো?'

নয়

অরণ্য অঞ্চলের আধিবাসীদের চরিত্রে একটা স্বাভাবিক সাহস আছে। দিগন্ত বিস্তৃত খোলা ময়দান, বনঝাউ আর নলখাগড়ার জঙ্গল, আর নদীর সঙ্গে তাদের আশৈশবের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নির্ভয়ে জঙ্গলে গরু মহিষ চরাতে বা কাঠ কাটতে গিয়ে, নদীতে স্নান করে, নৌকো চালায়, আখড়ায় কুস্তী লড়ে, মাহিষের দুধ খেয়ে তাদের জীবন শুরু হয়, আর এইভাবে জীবন কেটেও যায়। প্রকৃতির কোলে খেলা করে, পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়, নির্মল জল পান করে, দুধ দই খেয়ে আর নিয়মিত শরীর চর্চা করে সকলেই শক্তসমর্থ শরীরের আধিকারী ও জেদী স্বভাবের হয়। সীমাহীন জঙ্গল ও ময়দানের বিস্তৃতি শৈশব থেকেই তাদের মন ও মস্তিষ্কে এক স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। সাধারণত জমিদার শ্রেণী এইসব অঞ্চল থেকে বেশ দূরে থাকেন। সেখান থেকে এই অঞ্চলের লোকেদের উপর অন্যায় জুলুম ও জোর-জুবরদস্তি চালাতে পারেন না। বরং তাঁরা মনে মনে এদের ভয়ই পান। জমিদার জানেন এদের শারীরিক সামর্থ, পারিপার্শ্বিকতা, জেদী স্বভাব, আমৃত্যুপণ সাহসিকতা,—কোনো কিছুই তাঁর বশে নেই। এইকারণে তিনি এদের সমঝে চলেন। এসব লোকে মাঝে মাঝে কিছু অন্যায় কাজও করে, নিয়মিত 'কর' দেয়না, দিলেও অর্দ্ধেক বা তারও কম দেয়। জমিদার এদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস রাখেন না,—কাজেই সেসব অন্যায় অগ্রাহ্য করেন। পুলিশও এদের ঘাঁটাতে চায় না। কোনো জমিদার তাদের মতো প্রয়োজনের অতিরিক্ত গরম করলে পুলিশ লুকিয়ে চুরিয়ে এদের দু'একজনকে গ্রেপ্তার করে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষনা করে। এর বেশী কিছু নয়।

এরা যত স্বচ্ছন্দ স্বাধীন ও শক্তিশালী, ততই আকাট মূর্খ। কথায় কথায় লাঠি ওঠানো, লড়াই করা, হত্যা করা, অন্যের ফসল কেটে নেওয়া, বস্তিতে আগুন লাগানো, লুটপাট করা, সব নিত্য দিনের ব্যাপার। মাথা খাটিয়ে, ভেবেচিন্তে কোনো মীমাংসায় আসা এদের ধাঁতে নেই। লাঠি আর দৈহিক বলেই এরা সব সমস্যার সমাধান করতে চায়। একজন একদিকে ছুটল তো সবাই তার পিছনে ছুটবে। একজনের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো তো সকলে সমস্বরে সেই কথাই কপচাবে। যুক্তি, তর্ক, আলাপ, আলোচনা, আপোষ, মীমাংসা কিছুই জানেনা এরা। প্রতি ব্যাপারে জেদ, আর তার জন্যে প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জন দিতে পিছপা হয় না এরা। এদের কাছে শারীরিক বল, সাহস আর মৃত্যুর কদর সবচেয়ে বেশী। সেই ব্যক্তিই এদের নেতা হতে পারে যার দৈহিক বল সবচেয়ে বেশী; দ্বন্দযুদ্ধে সর্বদাই জয়ী হয়; মিছিলে সবার আগে লাঠি হাতে এগিয়ে যেতে পারে; ভরা নদী সাঁতরে পার হয়; আছড়ে কুমীর মেরে ফেলে; কোনো বড় জমিদারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে; জমিদারকে মারধর করে কিংবা সর্বসমক্ষে গালাগালি দিয়ে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে।

নিজেদের জমি, গরু ও মহিষ হল এইসব লোকেদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। জমির জন্য এরা প্রাণ দেয়। যে কোনো মূল্যে জমি সংগ্রহ করতে প্রস্তুত থাকে। জমিদার শ্রেণী এদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এদের ঠকায়। গরু-বলদ কিনতে এরা ছাতুর পুঁটলি বেঁধে, দলবল নিয়ে ঘর থেকে বেরোয়। জেদীর মতো দরদাম করে। যে দাম এরা ন্যায্য মনে করে তা' ছাড়া আর কোনো দামে তারা কিনতে রাজী নয়। সেখানে ধরণা দিয়ে পড়ে থাকবে, ধমকাবে, লাঠি তুলবে। বিক্রেতা যদি রাজী হয় ভালো, না হলে রাত-বিরোতে খুঁটি খুলে বলদ নিয়ে গিয়ে নদীর ধারের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখবে, আর সকলের কাছে নিজের বাহাদুরীর গল্প শোনাবে। ওরা এসব কাজকে অন্যায় বলে মনে করে না।

মটরু যখন চরের জমির ব্যাপার তাদের বুঝিয়ে বলেছিল, তখন মা গঙ্গার ভক্ত এক নির্ভীক পালোয়ানের কথা বলেই তারা চুপচাপ মেনে নিয়েছিল। মটরু জেলে যাওয়ার পর জমিদারের কথা তারা মানতে চায়নি। চাষ করার জন্যে জমিদার তাদের অন্য যে কোনো জায়গায় নিষ্কর জমি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা সে দান গ্রহণ করেনি। তাদের একই কথা, মটরু পালোয়ান ফিরে এলে সে যেমন বলবে সেইরকমই হবে। সে ফিরে আসার আগে কিছুই সম্ভব নয়।

পূজন চেয়েছিল মটরুর অসমাপ্ত কাজের ভার সে নিয়ে নেয়। কিন্তু মটরুর মতো তার সাহস ও শক্তি ছিল না যে একা একা নদীর ধারে, জঙ্গলের মাঝখানে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে আর জমিদারের সঙ্গে শত্রুতা করে চাষবাসের কাজ চালিয়ে যায়। সে ঠিক করেছিল দশ-বিশ জন চাষীকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে থাকবে ও সকলে মিলে চরের জমিতে চাষ-আবাদ করবে। কিন্তু শুধু মটরুর নামে কাজ হল না।

'সব শিয়ালের এক রা',—মটরু আসার আগে কেউই কোনো নতুন কাজে হাত দিতে রাজী হল না।

নিজেদের প্রতিষ্ঠা বলবৎ রাখার চেষ্টায় জমিদার শ্রেণী চরের জমিতে চাষ-আবাদ শুরু করল। এই কাজটা প্রায় বাঘের মুখে হাত দেওয়ার সমান। সাধারণত এমন কাজ করতে তারা সাহস করে না, কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে তারা সক্রিয় না হলে ঐ অঞ্চলে তাদের প্রতিপত্তি কমে যাবে। সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। কাজেই তারা সেখানে ঝুপড়ি তৈরি করাল। সেখানে নিজেদের লোক রেখে চাষ করাল, আবার জমি পাহারার কাজে কিছু শক্ত সমর্থ লোক মাইনে করে রাখা হল। তাদের জানানো হল অরণ্য অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে ব্যবহারে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে। ঐ অঞ্চলের ব্যক্তিদেরই ওরা পাহারার কাজে রাখতে চেয়েছিল,—কিন্তু তারা কেউই রাজী হয়নি। জমিদারের প্রচুর অর্থব্যয় হল। ফসল কেটে ঘরে তোলার আগে তার দামের চেয়ে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় হয়ে গেল। জমিদারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। জমিদারের প্রতিপত্তি না থাকলে চলবে কী করে?

ফসলের চারা বড় হল। দেখতে দেখতে বুক সমান উঁচু হল। তা' দেখে ওখানকার চাষীরা রাগে ফুঁসত, যেন তাদের নিজস্ব জমি জোর করে অধিকার করে অন্য কেউ তাতে ফসল ফলিয়েছে; যেন তাদের বাড়ি থেকে শস্য বোঝাই বস্তাগুলো অন্য লোকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা নিরুপায় হয়ে দেখে যাচ্ছে।

পূজন এই পরিস্থিতির সুযোগ নিল। মটরুর সঙ্গে কুটুম্বিতা হওয়ায় চাষীরা তাকে যথেষ্ট খাতির করত। সে চাষীদের মধ্যে চুপি চুপি প্রচারের কাজ শুরু করল,—'বাইরের লোক এসে আমাদের চোখের সামনে মা গঙ্গার জমির ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে,—এ ঘোর অন্যায়। মনে রেখো, একবার যদি এই ফসল জমিদারের বাড়িতে পৌঁছয় তাহলে অনর্থ হবে। মটরু দাদার ফিরে আসতে আরো এক বছর। ততদিনে এই সমস্ত জমি ওরা হাত করে নেবে। মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে কুমীরের কী অবস্থা হয় জানতো? জমিদারের সেই অবস্থাই হবে। শুধু 'মটরু-মটরু' রব তুলে বসে থাকলে চলবে না। এই অবস্থায় মটরু থাকলে কী করত সেটা একটু ভেবে দেখ। এই ফসল যাতে জমিদারের গোলায় না পৌঁছয় সেই ব্যবস্থা আমরা তো করতেই পারি, তাই না কী? কথাগুলো চাষীদের মনকে নাড়া দিল। অনেকেই পূজনের সহায়তায় এগিয়ে এল। প্রস্তুতি সারা হল। ফসল পাকতেই রাতারাতি কেটে নিয়ে নৌকোয় করে নদীর ওপারে পাচার হয়ে গেল। অবস্থা বুঝে জমির রক্ষাকর্তারা সরে পড়ল। জমিদারের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মতো বোকামি করতে কেউ প্রস্তুত ছিল না।

পরের দিন হৈ চৈ পড়ে গেল। দু একজন লাল পাগড়িধারীকে মোড়লের বাড়িতে দেখা গেল। তারপর আবার সবকিছু শান্ত। চুরির কোনো হদিশ পাওয়া গেল

না। চাষীরা সকলে এক বাক্যে বলল যে চোর নদীর ওপার থেকে এসেছিল, নদীর ধারে কিছু কিছু চিহ্ন তারা রেখে গেছে। রাতারাতি ফসল লুট করে গা ঢাকা দিয়েছে সবাই। তারা কেউ কিছু টের পায়নি। টের পেলে কী তারা লাঠি চালাত না? এই ঘটনায় জোয়ান চাষীদের সাহস বেড়ে গেল। এবার রাতবিরেতে তারা বনঝাউ আর নলখাগড়ার জঙ্গলও লোপাট করতে লাগল। কখনো আবার মনের রুদ্ধ আক্রোশ শান্ত করার জন্যে ঐ সবে আগুন ধরিয়ে দিল।

জমিদার শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। এমন অসহায় অবস্থা তাঁর কখনো হয়নি। একবার পুলিশকে টাকা খাইয়ে তার পরিণাম তো দেখলেন। ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার কোনো অর্থ হয় না।

পূজনের খাতির আরো বেড়ে গেল। কিন্তু ওর পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব ছিল না। জমিদারও চুপ মেরে গেলেন। মনে করলেন এদের ঘাঁটিয়ে কোনো লাভ নেই, বরং উনি শান্ত থাকলে চাষীরাও হয়ত শান্ত হয়ে যাবে,—অবস্থা আবার আগের মতো হবে। জমিদারের তরফ থেকে সাড়াশব্দ না পেয়ে চাষীরাও অগত্যা মটরুর অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগল। সে আসুক, তারপর যা হবার হবে। সে বছর আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল না।

□

গোপীর বাড়িতে স্বল্প সময় কাটিয়ে মটরু বিষাদ মগ্ন হল। বেলা প্রায় তিন প্রহরে গাড়ি স্টেশনে পৌঁছেছিল। সেখান থেকে নদী দশ ক্রোশ রাস্তা। মটরু মুহূর্তের জন্যে কোথাও দাঁড়ায়নি,—একটু জিরোয়নি। ভূতগ্রস্তের মতো রাস্তা হেঁটে চলেছে। বহুকাল অদর্শনে অস্থির বিরহী প্রিয়ার মতো নদীর উচ্ছল জলধারা তাকে তীব্র আকর্ষণ করছিল। মা গঙ্গার কোলে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে সে ছুটে চলেছিল। কতদিন হয়ে গেল সেই হাওয়া মাটি আর জলের থেকে দূরে রয়েছে সে। ওঃ যদি তার পাখা থাকত!

পথেই গোপীর বাড়ি। মটরু ভেবেছিল দু-চার মিনিট দাঁড়িয়ে গোপীর বাড়ির খবরাখবর নিয়ে আবার দৌড়বে, আর রাত্রের মধ্যেই নদীর ধারে পৌঁছে যাবে। কিন্তু গোপীর সংসারের পরিস্থিতি দেখে তাকে থেকে যেতে হল। ঐ দুঃখী মানুষগুলিকে ফেলে পালিয়ে আসা সহজ কাজ ছিল না। তার মন অস্থির হচ্ছিল, কিন্তু 'থাকতে পারব না' এই কথা কিছুতেই বলতে পারল না। তাদের আদর যত্ন অস্বীকার করে, দুঃখী মনে আঘাত দিয়ে চলে যাওয়ার কথা বলার মতো কঠিন প্রাণ মটরু পাবে কোথা থেকে?

খাওয়া-দাওয়ার পর গোপীর মা ও বাবার সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা

হল। তারপর ক্লান্ত হয়ে মা শুতে গেলেন, বুড়ো বাপের নাক ডাকতে লাগল, মটরুও ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় ঘুম? সেই নদী, জঙ্গল, হাওয়া, মাটি হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। তাকে কোলে নেওয়ার জন্যে অস্থির হচ্ছে তারা; আর মটরু এত কাছে এসেও সবকিছু ভুলে এখানে পড়ে আছে? 'আয় আয়, ছুটে চলে আয়। কতদিন তোকে ছেড়ে কষ্ট পাচ্ছি। আয়, তাড়াতাড়ি বুকে আয় আমার। আয়।' ডাক শুনে মটরু রোমাঞ্চিত হল। ব্যাকুল হয়ে উঠে বসল। চারিদিকে তাকিয়ে সে খুঁজছিল, যেন বড় কাছে এই ডাক। মটরু যেতে পারল না বলে মা গঙ্গা নিজেই এসেছেন তার কাছে।

মটরু উঠে দাঁড়াল, তারপর একছুটে পালাল সেখান থেকে। তার ভয় করছিল আবার তাকে ধরে বসিয়ে দেবে ওরা। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা আর ঘন অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না। মটরুর পা দুটো যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলেছিল, গঙ্গা মায়ের কাছে পৌঁছনোর পথ তার চেনা। দরকার হলে ইস্পাতের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে নতুন রাস্তা তৈরি করে নেবে সে।

ফসল কেটে নেওয়া খোলা জমির উপর দিয়ে মটরু ছুটছিল। আর এক মুহূর্তের দেরীও সহ্য হচ্ছে না তার। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, পায়ে কাঁটা বিঁধছে, মটরু বেহুঁসের মতো ছুটে চলেছে। তার চোখের সামনে শুধু গঙ্গার প্রবল জলচ্ছ্বাস, মনে মনে একই কথা উচ্চারণ করে চলেছে, 'আসছি মা, আসছি!'

ঘুমন্ত পৃথিবী উষ্ণ শ্বাস ফেলছে। বাতাস স্তব্ধ। উত্তাপে অস্থির রাত্রিদেবী। সীমাহীন নিস্তব্ধতা। মিলনের আর্তি বুকে নিয়ে মটরু ছুটে চলেছে। তার শরীর ঘর্মাক্ত। ভিজে চোখের অন্ধকারে মা গঙ্গার ছবি,—দু হাত বাড়িয়ে তিনি তাকে কোলে তুলে নেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসছেন। আকাশের তারারা নিষ্পলক চোখে তাকে দেখছে। মটরু মা গঙ্গা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কানেও সে শুধুই মায়ের আহ্বান শুনতে পাচ্ছে। তার মনপ্রাণ মায়ের কোলে পৌঁছবার জন্যে অস্থির। সে ছুটে চলেছে, শুধু ছুটে চলেছে।

এই তো হাওয়ায় নদীর গন্ধ। নদীর ধারের মাটির সোঁদা গন্ধ। মায়ের আঁচলের গন্ধ যেন। মটরুর প্রাণ উন্মত্ত হল। তার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত। বিদ্যুৎ ভর করল তার পায়ে। সে চিৎকার করে উঠল, 'মা—মাগো!' নদীর জলধারা সাড়া দিল, 'আয় বাছা, আয়।' চারিদিকে সেই সুর প্রতিধ্বনিত হল, 'আয় বাছা, আয়।' সমস্ত পৃথিবী যেন ডেকে উঠল, 'আয় বাছা, আয়।'

যেন কোটি কোটি বিহ্বল মা ও সন্তানের ডাক আকাশে বাতাসে গুঞ্জরিত হল। তার ডাকে সাড়া দিয়ে, তাকে বুকে টেনে নিতে, দশ দিক যেন ছুটে এল তার কাছে। মটরু ক্ষুধার্ত শিশুর মতো গঙ্গা মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা গঙ্গা তার কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তার সন্তানকে,—যেন তাঁর দেহ-মন-প্রাণ সবকিছু তাকে

সমর্পিত করে দিলেন। যেন নদীর কলস্বর নয়,—মায়ের আদরের আর চুম্বনের শব্দ। চারিদিক নেচে উঠল, হাওয়া গান গাইল, মাটি খিল খিল করে হেসে উঠল,—এসে গেছে! আমার ছেলে, আমার আদরের ছেলে এসে গেছে আমার কাছে!

দশ

বৌদি জানত এ অসম্ভব,—কিছুতেই হতে পারে না, তবু এই স্বপ্ন সে তার মনে অতি গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কেন?

যেমন জল, যেমন হাওয়া, ঠিক তেমনি মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে এই দুটো বস্তু ছাড়া একটা অবলম্বনও তো চাই। যার কোনো অবলম্বন নেই সে কল্পনার আশ্রয় নেয়। একটা স্বপ্নকে সাজিয়ে নেয় মনে মনে। সেই কল্পনার হয়ত সত্যি কোনো আধার থাকে না। মিথ্যা কোনো আধার নিয়েও মানুষ রঙিন স্বপ্নের জাল বোনে। সেই স্বপ্নই তাকে বেঁচে থাকার শক্তি জোগায়। কে জানে বিচিত্র এই জগতে কার কল্পনা একদিন সত্যের রূপ নেয়।

যখন কোনো উপায় থাকে না তখনই মানুষ কল্পনার জগৎ গড়ে নেয়। বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহাই তাকে এমন করতে বাধ্য করে। বৌদিও তাই করেছিল। তার এই স্বপ্ন দেখা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

বৌদির মনের নিভৃতে যে আশা অঙ্কুরিত হয়েছিল, সেদিন মটরুর মুখে গোপীর কথাগুলো শুনে তাতে যেন অমৃত সিঞ্চন হল। কথাগুলো তার হৃদয়ে ঝংকার তুলল। মন্ত্রের মতো সে মনে মনে উচ্চারণ করে, 'বৌদিকে নিয়ে গোপীর খুব চিন্তা। বেচারীর মুখে দিনরাত খালি বৌদি আর বৌদি। দুজনে ভারী ভাব, তাই না?' তার প্রাণ মন এক মধুর সুরের ধারায় বিভোর হয়। সমগ্র অন্তরাত্মা বিহ্বল হয়ে বলে ওঠে, হ্যাঁ, খুব ভাব, অনেক...। বিদেশী বন্ধু, তুমি তাকে চিঠি লিখো। আমার কথাও লিখে দিও তাকে। আমিও সর্বদা তার কথা ভাবি। আমার মনপ্রাণ দিনরাত তারই জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। হ্যাঁ বিদেশী, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি।'

এই মন্ত্র বৌদির জীবনটাকে অনেক বদলে দিল। সেই বিরক্তি, তিক্ততা, অশান্তি, অভিমান, হতাশা সব কোথায় মিলিয়ে গেল। জীবনে আবার উৎসাহ ফিরে এল। কাজকর্মে মন বসল, পূজো-পাঠের অর্থ খুঁজে পেল, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাতেও মন লাগল। ব্যর্থ জীবনে এক সার্থকতার আভাস। কেউ একজন আছে, যার তাকে নিয়ে খুব চিন্তা। যার মুখে দিনরাত শুধু তারই নাম। কেউ আছে...কেউ তো আছে...

বাড়ির ঝগড়াঝাটি বন্ধ হল। আবার সব কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল। দুবেলা

মুখের সামনে তৈরি খাবার, মিষ্টি কথা, আজ্ঞাপালনে সতত প্রস্তুত পুত্রবধূ, ঘরের কাজে একটুও হাত-পা না-নাড়তে হওয়া, অনেক রাত পর্যন্ত হাতে পায়ে মালিশ,—শাশুড়ির আর কোনো নালিশই রইল না। যে বৌ-এর কপাল পুড়েছে এইরকম লক্ষ্মী হয়ে ঘরের কাজে মন দেওয়া ছাড়া সে আর করবেই বা কী? বৌ-এর সেবাযত্নে শ্বশুর আগে থেকেই কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি জানতেন পুত্রবধূ যদি অবহেলা করে তবে তাঁর মৃত্যু অবধারিত। এইরকম পরিচর্যা তার স্ত্রীর পক্ষে করা অসম্ভব। তিনি তো স্বামীর দীর্ঘ রোগ ভোগে তিতিবিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে এমন শাপশাপান্ত করেন যেন বুড়োটা একটা ভার বোঝা। বৌ-এর অক্লান্ত সেবা শ্বশুরের মনে আবার বেঁচে ওঠার আশা জাগায়। মনে মনে তিনি সর্বদা তাকে আশীর্বাদ করেন মৃদুস্বরে উচ্চারিত সেই আশীর্বচন শুনতে পেয়ে বৌদি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, আমার মতো অভাগীকে আপনি আশীর্বাদ করেন কেন?' বুড়োর দুচোখ জলে ভরে আসে। তিনি ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠেন, 'জানি বৌমা, এই আশীর্বাদ অর্থহীন, তবু আমার মন মানে না। আমি মনে প্রাণে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও।'

বৌদি করুণ হেসে উত্তর দেয়, 'সুখ তো তারই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে বাবা।' তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ে। 'তুই সত্যি কথাই বলেছিস বৌমা', আর্দ্র কণ্ঠে শ্বশুর বলেন, 'স্বামীই তো মেয়েদের ইহকাল পরকাল।' বুড়োর কোলে মাথা রেখে বৌদি রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'আমার ইহকাল পরকাল দুই-ই শেষ হয়ে গেছে বাবা। আমাকে আশীর্বাদ করুন, যাতে তাড়াতাড়ি এই সংসার থেকে ছুটি পাই।' 'না বৌমা, না! এই পঙ্গু বুড়োটাকে ফেলে চলে যেতে চাইছিস?' কম্পিত কণ্ঠস্বরে বুড়ো বলে।

মুখ তুলে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বৌদি বলে, 'দেওর নতুন বৌ আনবে, সে কী আমার চেয়ে কম সেবা করবে?' 'কে জানে কেমন বৌ আসবে। তুই তো আগের জন্মে আমার মেয়ে ছিলি। অনেক পুণ্য করেছিলাম তাই এই জন্মে তুই আমার পুত্রবধূ হয়ে এলি।' বুড়ো গদগদ কণ্ঠে বলে, 'পরের মেয়ে কী এমন সেবা করতে পারে? তোর মতো বৌ পেয়েছি এ তো আমার সৌভাগ্য। তা না হলে এই শরীরটা কবেই গলে পচে নষ্ট হয়ে যেত।' 'আমার দুর্ভাগ্য যে সারাজীবন আমি বিপদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছি। প্রাণটাও বেরোয় না। রোজ ভাবি, কবে আমার প্রাণ বেরোবে, কবে আমি মুক্তি পাবো। আমার জীবনে আর আছেই বা কী, যার জন্যে আমি বেঁচে থাকবো?' বৌদি অসহায়ের মতো বলে। 'নিজের ভাগ্যে কী কেউ মরে বাঁচে রে পাগলি!' বুড়ো সান্ত্বনা দেয়, 'কে জানে কার ভাগ্যে তুই বেঁচে আছিস। আমার তো মনে হয় আমার ভাগেই তুই বেঁচে আছিস। ভগবান আমাকে এই রোগ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে তোর মতো বৌ-ও দিয়েছেন, যে দিনরাত আমার সেবা করবে। বৌমা, আমরা চাইলে কিছু হয় না। ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই হয়। ভগবান কী চান তিনিই জানেন। বৌমা, আমার তো মনে হয় আমার সেবার জন্যেই তুই জন্মেছিস।...হ্যাঁরে,

তুই যে এত মৃত্যুর কথা চিন্তা করিস, তখন গোপীর কথা মনে পড়ে না? তোদের দুজনের তো ভারী ভাব ছিলো। সেদিন মটরুও বলছিল গোপীর তোকে নিয়ে খুব চিন্তা। বৌ, সে তোকে খুব মানে। ও যতদিন বেঁচে থাকবে তোর কোনো কষ্ট হতে দেবে না। তুই নিশ্চিন্তে থাক।' 'কে জানে কার ভাগ্যে কী লেখা আছে, বাবা আমার দেওরকে আমিও কিছু কম ভালোবাসি না। ওকে একবার দেখে নিয়ে আমি মরে যেতেও পারি। কে জানে তার নতুন বৌ কেমন হবে, আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে। আমি তো সহ্যই করতে পারব না। দেওর যদি বিরূপ হয়, তখন আমি কোথায় যাব?' বৌদি আবার ফুঁপিয়ে উঠল। 'এসব কী বলছিস বৌ?' বুড়ো সস্নেহ ধমক লাগাল, 'তুই আমার বড় বৌ। তুই সংসারের কর্ত্রী হয়ে থাকবি। আমি থাকতে...'

'আপনার কতটুকু ক্ষমতা বাবা? যদি সুস্থ থাকতেন তাহলে কোনো চিন্তাই ছিল না। একজন এসে আমার দেওরকে যাদুমন্ত্র করবে, আর তার বশে এসে...না বাবা, আমার মরে যাওয়াই ভালো। তালপুকুরে...'

'বৌমা!' বুড়ো চিৎকার করে উঠল, 'তালপুকুরের নাম মুখেও আনবি না। জানিস না, তুই কোন বংশের বৌ। বাড়িতে মরে পড়ে থাকিস সে-ও ভাল, কিন্তু আমাদের বংশে কলঙ্ক লাগাতে দিস না। কারুর মুখে যদি কখনো শুনতে হয়, অমুকের বৌ তালপুকুরে ডুবে মরেছে তাহলে মাথা খুঁড়ে মরব। এই বুড়োটাকে মনে রেখে যা করার করিস।' বুড়ো আবেগে কাঁপতে থাকে।

আঁচলে চোখ মুছে বৌদি চলে যায়। এই বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াই বৃথা। এ কিছু বোঝে না—কিচ্ছু না। এর শুধু নিজের সেবাযত্ন নিয়ে চিন্তা। বুড়িরও ঘরের কাজ আর তার সেবার জন্যে তাকে চাই। কিন্তু তার যে কী চাই সে কথা কেউ ভাবে না। কেউ ভাববেই বা কী করে? স্বপ্নেও কী কেউ কল্পনা করতে পারে যে ক্ষত্রী বংশের বিধবা বৌ...অসম্ভব, অসম্ভব। বৌদির মন ক্ষুব্ধ হয়। তখনই কানের কাছে কেউ যেন গুঞ্জন করে, 'তোমাকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়, বৌদি! আমি দিনরাত তোমার কথাই বলি। তোমাকে আমি কত ভালোবাসি তা' কী ভুলে গেছ? আমাকে আসতে দাও বৌদি, তারপরে...'

বৌদি যেন কী এক আবেশে বিভোর হয়। আর কেউ নাই বা ভাবল তার কথা, সে তো ভাবে...। বৌদি আবার নিজের কাজে মন দেয়। আবার সব কাজকর্ম আগের মতো চলতে থাকে। সেই পূজো, সেই রামায়ণ পাঠ, সব কিছুই সেইরকম। ঠাকুরের কাছে সে প্রার্থনা করে, 'তোমার অসাধ্য কিছুই নেই ঠাকুর। অসম্ভবকেও তুমি সম্ভব করতে পার। এমন কিছু কর যা'তে...।'

একদিন সকালে বিলরার হাতে মোষের জন্যে জাব দিতে গিয়ে মনে হল, বিলরা যদি আবার সেই কথা বলে। বিলরা সন্ত্রস্ত ভাবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল, বৌদি

বলল, 'কীরে, অমন চুপ করে আছিস কেন, কাউকে খুন করে এলি নাকী?'

মাথা নীচু করে বিলরা বলল, 'সত্যি ছোটমা, আমার মুখ দিয়ে সেদিন এমন কথা বেরিয়ে গেল...'

'আরে ওসব আমি ভুলেই গেছি। তুই শুধু শুধু...' 'ছোটমা, আমি মনের কথা চেপে রাখতে পারিনি, বলে ফেলেছি। আমার কথায় আপনি কষ্ট পেয়েছিলেন,—আমাকে মাপ করবেন। ছোটমা আমরা সোজা মানুষ। আপনারা মনে এককথা রাখেন আর মুখে অন্য কথা বলেন। আমি তো অবাক হয়ে ভাবি,—বড়বাবু, আর বড়মা আপনার এই বেশ কী করে সহ্য করেন! আমার তো বুক ফেটে যায়। এই কী আপনার সন্ন্যাসিনী হওয়ার বয়স? এইজন্যেই মনে হল যদি ছোটবাবুর সঙ্গে আপনার...'

বৌদির মন নরম হল। চোখ বুজে এল। পরক্ষণে কেউ যেন তাকে তীব্র কশাঘাত করল। 'এমন কথা বলিস না বিলরা,' বলে সে ছুটে ভেতরে চলে গেল।

বিলরা কিছুক্ষন স্তব্ধ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, তারপর করুণ হেসে জাবের ঝুড়িটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। মনে মনে ভাবল, সেদিন উনি খুব রেগে গেছিলেন, আজ আর রাগ করেননি। আজ বকেননি তাকে। সত্যি এমন হলে কত ভালো হত। বেচারী জীবনে আবার সুখের মুখ দেখত। ছোটবাবু যদি বিয়ে করতে না পারেন, ওঁকে রাখতে তো পারেন। এঁদের সমাজে এমন হামেশাই হয়। শোনা যায় এঁদের প্রপিতামহ একজন নীচুজাতির মহিলাকে রেখেছিলেন। আর ইনি তো ছোটবাবুর বৌদি। কিছুদিন একটু হৈ চৈ হবে, তারপর সব শান্ত হয়ে যাবে। কশাইগুলোর হাত থেকে তাঁর প্রাণ তো বাঁচবে। কত পুণ্য হবে।

□

দু একমাস পরে পরে রাতবিরেতে মটরু আসে খবর নিতে। এখন সে খুব সতর্ক থাকে। শত্রুদের সে আগের মতো আর কোনো সুযোগ দেবেনা। নদীর চর ছেড়ে সে কোথাও যায়না। সে জানে এই অঞ্চলে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। সে আর আগের মতো একলা নেই। তার ঝুপড়ির আশে পাশে আরো অনেক ঝুপড়ি গড়ে উঠেছে। প্রায় জনা পঞ্চাশেক চাষী-যুবক লাঠি সোঁটা নিয়ে সেই ঝুপড়ি গুলোয় বাস করে। কুস্তীর আখড়াও খোলা হয়েছে। সকলের গরু-মোষও সেখানে থাকে। মটরু যখন এলো ততদিনে গমের ফলন শেষ হয়েছে। সকলে জানত নদীর চরে শুধু গমের চাষ হতে পারে। এর পরে বর্ষা শুরু হবে, চারদিক জলে ভরে যাবে। কিন্তু মটরু খালি বসে থাকার পাত্র নয়। সে ঠিক করল এবার আখের চাষ করবে। সকলে নিষেধ করল, কিন্তু মটরু কারো কথাই শুনল না। সে বলল, 'মা গঙ্গার কৃপা হলে

আখের ফলনও ভালোই হবে। ভালো জমি দেখে সে আখ লাগালো। তার দেখাদেখি আরো কিছু লোক সাহস করল। একজনের যা পরিণাম হবে, সকলেরই তা হবে। যদি না হয়, না হল, কিন্তু ফলন যদি ভাল হয়, তাহলে অঢেল গুড় পাওয়া যাবে।

চর একেবারে জম জমাট হয়ে উঠেছে। অনেকগুলো ঝুপড়িতে উনুন জ্বলছে। মোষেদের হাম্বা রব শোনা যাচ্ছে। আখড়া জমে উঠেছে। বিশেষ পরিশ্রম না করেই আখের ফলন এত হয়েছে যে অবাক হতে হয়। নরম চিকন পলিমাটির সঙ্গে কী ঐ পাথুরে জমির তুলনা হয়? সেখানে অনেক পরিশ্রমের পর চার হাত লম্বা আখ ফললেই সকলে খুশী। আর এখানে এত আখ, যে আখের জঙ্গলে হাতিও হারিয়ে যায়। এখন শুধু মা গঙ্গাকেই ভয়। বর্ষা প্রায় এসে গেছে। নদীর জল বাড়ছে। সকলেরই প্রাণে ভয়। সবাই বলছে, 'মা গঙ্গা, কৃপা করো, আখগুলো কেটে নিতে দাও।' সকলের বিনীত প্রার্থনা মা গঙ্গা এবার যেন তাঁর দিক পরিবর্তণ করেন।

আশ্চর্যের কথা সত্যিই নদীর মূল ধারাটি এবার অন্যদিকে প্রবাহিত হল। এপারেও জল বেড়েছিল, কিন্তু দশ-পনের দিন পরেই আখ গাছের গোড়ায় নতুন মাটি ঢেলে দিয়ে জল নেমে গেল। চাষীদের আনন্দের অন্ত রইল না। মটরুকে বাহবা দিচ্ছে সবাই। সে বলছে, 'এ সবই মা গঙ্গার কৃপা।'

জমিদার এবর সোজাসুজি বিরোধিতা করছেন না। মটরু এখন আর একা নেই। তবে শোনা যাচ্চে যে চাষীরা তাঁর জমি দখল করে নিয়েছে জানিয়ে তিনি সদরে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন,—সরকার খোঁজ খবর করে যেন দোষীদের শাস্তি দেন, অন্যথায় এরা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

তারপর কী হলো কিছু বোঝা গেল না। সরকারি কাছারি অনেক দূরে, সেখানে নালিশ পৌঁছতে, শুনানি হতে ঢের সময় লাগে, ততদিন কী চরের জমিতে কোনো চিহ্ন পড়ে থাকবে? যদি কিছু হয়, দেখা যাবে। পাটোয়ারীর নক্সায় লেখা আছে 'নদীর চর', কাগজে চরের মালিকানা কাউকে দেওয়া নেই। কোনো বেড়াও তো দেওয়া নেই সেখানে, বেড়া দিলে মা গঙ্গা কী তা' রাখতে দেবেন? সরকার কিসের খোঁজ খবর করবেন!

□

বর্ষার সময়টা মটরু ও তার সঙ্গীরা খুব সাবধানে রইল। তাদের একটা দল গড়ে উঠেছে। আশে পাশের গ্রামের চাষীরা তাদের বন্ধু স্থানীয়। তারা সব ব্যাপারে খোঁজখবর রাখে ও মটরুকে এসে জানায়। শতাধিক লোক মটরুর কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। মটরুকে ধরা সহজ কাজ ছিলোনা।

মটরু তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে অনেক রাত্রে গোপীর বাড়িতে যেত আর

রাত থাকতেই ফিরে আসত। গোপীর বাড়ির লোকেরা অনেক আশা নিয়ে তার খাতির যত্ন করত, 'গোপীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে কোথাও?' মটরু বলত, 'কথাবার্তার কী দরকার? মেয়ের কী অভাব আছে? গোপী ফিরে আসুক, একমাসের মধ্যে ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলব। এমন বৌ আনব, সবাই তাকিয়ে দেখবে।'

মটরু গোপীকে নিয়মিত চিঠি দেয়। কিন্তু তার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ সে জানায়নি তাকে। শুধু শুধু দুঃখের খবর জানানোর কী প্রয়োজন? সে চলে আসার পর গোপী কেমন করে দিন কাটাচ্ছে কে জানে। কতবার তারসঙ্গে দেখা করার কথা ভাবে। কিন্তু সময় কোথায়, তাছাড়া চাষী-ভাইদের ছেড়ে, মা গঙ্গাকে ছেড়ে যাবে কেমন করে? তার জোরেই তো সকলের জোর। তার অনুপস্থিতিতে জমিদার যা খুশী করতে পারেন।

অন্দরে খেতে বসে মটরু বৌদির রান্নার প্রশংসা করে, 'এবার বুঝলাম, গোপী কেন এত বৌদির ভক্ত। আমি ভাবতাম, ব্যাপারটা কী। এত ভালো রান্না যে খাবে সে কী কখনো ভুলতে পারবে?'

শাশুড়িও বলেন, 'দুই বৌ ই গুণের ছিল। কী করব, সবই অদৃষ্ট।'

বৌদি শোনে আর মনে মনে কত কী যে ভাবে। একবার সুযোগ বুঝে মটরুকে দেখাও দিয়েছে। মটরুও তাকে দেখতে উৎসুক ছিল। কিন্তু দেখার পর প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। গোপীর বৌদি যে এখনও তরুণী আর তার এত রূপ এ কথা সে কখনো ভাবেনি। তার মন বৌদির প্রতি সমবেদনায় ভরে গেল। এই সমবেদনা বোঝানোর জন্যেই সে গোপীর মা ও বৌদির সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। বৌদির মন আনন্দে ভরে ওঠে।

মটরু চিন্তিত হয়ে পড়ে। গোপীর বৌদির মতো সুন্দরী মেয়ে গোপীর জন্যে সে কোথা থেকে খুঁজে আনবে? এমন সুন্দরী মেয়ে এর আগে সে কখনো দেখেনি। গোপী যে বৌদি-অন্ত-প্রাণ এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এমন মেয়ের জন্যে প্রাণও দেওয়া যায়। এর বোনও নিশ্চয়ই এরই মতো সুন্দরী ছিলো। অন্য কোনো মেয়ে কী তার মনে ধরবে।

বিলরার মতো মটরুর মনেও একটা চিন্তার উদয় হল। সে নদীর চরে স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন জীবন যাপন করে, সমাজের রীতি-নীতির কোনো সংস্কার তার মনে নেই। সংস্কারহীন মুক্ত জীবন তার। যখন যা মন চায় তাই করে। কোনো বন্ধন মানে না। সে জানে মানুষের দেহে শক্তি ও মনে সাহস থাকা একান্ত প্রয়োজন, তাহলে কোনো ব্যাপারে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। মটরু মনে মনে স্থির করল, যদি গোপী এই কাজের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে সে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবে। অনেক বাধা আসবে। গোপীকে হয়ত বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হবে। নদীর চরে আরো একটি ঝুপড়ি তৈরি হবে। ওরা দুজনে থাকবে সেখানে। পাখিটার প্রাণ রক্ষা পাবে।

এগারো

শাস্তির মেয়াদ শেষ করে জেল থেকে বেরিয়েও গোপী মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে পারল না। সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। আজ তাকে বৌদির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। তাকে বিধবার রূপে দেখতেই হবে। গত চারবছর ধরে চেষ্টা করেও বৌদির সামনে দাঁড়ানোর মতো মনের জোর সে এখনও পায়নি।

গোপী যখন গ্রামে পৌঁছল তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। শীত কাল। চারিদিক নিস্তব্ধ। পুকুরের ধার থেকে দু একজনের লোকের কাশি আর গলাঝাড়ার শব্দ আসছে। ঘাটে লোক নেই। গ্রামের উপর জমে থাকা কুয়াশার চাদর ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসছে।

গোপী ভাবল একটু এগিয়ে গিয়ে ওদের কারুর কাছে বাড়ির খবর নেবে। পরে ইতস্ততঃ করল। কাছেই একটা ছোট মন্দির ছিল। ভাবল, পূজারীর সঙ্গে দেখা করে আসবে। ভগবানের দর্শনও হবে, পূজারীর কাছে বাড়ির খবরও জেনে নেবে। গোপীর মন অস্থির হয়ে উঠছিল। এতদিন সে বাড়ি থেকে দূরে রয়েছে,—এর মধ্যে না জানি কত কী ঘটে গেছে সেখানে। তার ভয় করছিল পাছে কোনো খারাপ খবর শুনতে হয়।

মন্দির শূন্য। সে আশ্চর্য হল, এটা আরতির সময়, এই সময়ে মন্দিরে এই শূন্যতা কেন? মন্দিরের চত্বরে একটা বুড়ো ভিখিরি তার ঝুলিতে রাখা রুটিগুলি গরম করার জন্যে আগুন জ্বালছিল, গোপীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার, ভাই?' 'মন্দির বন্ধ কেন? পূজারীজী নেই?' গোপী তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। ভিখিরিটি হাসল। তার ফোকলা মুখ দিয়ে অনেকটা থুতু বেরিয়ে এলো, 'তুমি বুঝি এখানে থাকো না? পূজারী তো বছর তিনেক আগেই পালিয়েছে। গাঁয়ের এক বিধবার সঙ্গে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে কোন চুলোয় গেছে কে জানে।' সে আবার অট্টহাস্য করে উঠল। গোপী কম্পিত হাতে নিজের দু কান বন্ধ করল। তার হৃদ্স্পন্দন দ্রুত হল। আর এক মুহূর্তও সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ব্যাকুল হয়ে সে সোজা বাড়ির দিকে চলেছিল, একটাই আশঙ্কা মনে বার বার উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল, কী জানি...

গ্রামের যেসব লোকে বাড়ির সামনে বসে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, দুঃখ ও ব্যাকুলতার প্রতিমূর্তির মতো গোপীকে সেখান দিয়ে যেতে দেখে নীরবে তারা তার সঙ্গ নিল। মূক দৃষ্টিতে গোপী তাদের কৃতজ্ঞতা জানাল। কোনো প্রশ্ন করার মতো মানসিক স্থিতি গোপীর ছিল না, লোকগুলিরও নয়। দেখে মনে হচ্ছিল কোনো প্রিয় ব্যক্তির দাহ-সৎকার শেষে তারা নীরবে ঘরে ফিরছে।

কেউ ছুটে গিয়ে গোপীর বাড়িতে তার আসার খবর দিয়ে এল। বাড়ির কাছাকাছি

পৌঁছতে কান্নার রোল কানে এল গোপীর। তার মন অস্থির, ব্যাকুল হল; পা কাঁপতে লাগল; চোখের সামনে অন্ধকার; মাথা ঘুরছে। সঙ্গে যারা ছিল, তারা ওর অবস্থা দেখে কাছে এসে তাকে ধরল। একজন বলল, 'বড় ভেঙে পড়েছে বেচারা। ভাই চলে যাওয়ার দুঃখটাই কী কম ছিল, যে ভগবান ওর বৌটাকেও কেড়ে নিলেন?'

কথাটা গোপীর কানে যেতেই সে চক্ষু বিস্ফারিত করে বলে উঠল, 'কী?' কয়েকজন একই সঙ্গে বলল, 'দুঃখ করে কী হবে ভাই? তোমার সঙ্গে তার এই কটা দিনের সম্পর্কই অদৃষ্টে লেখা ছিল। এখন যারা আছে, তাদের কথা ভাবো। এখন তুমিই তাদের একমাত্র ভরসা।

গোপীর মনে হল একটি জ্বলন্ত শলাকা তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে তার শরীর মনকে জ্বালিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। সে মূর্ছিত হয়ে পাশের লোকটির হাতের উপর পড়ে গেল।

ওরা তাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে এসে খাটিয়ায় শুইয়ে দিল। মুখে জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগল। মা আর বৌদি কেঁদে কেঁদে অস্থির। পাড়ার মেয়েরা তাদের শান্ত করছে। বাতে পঙ্গু বাবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিলাপ করছেন। বয়স্করা তাঁকেও বোঝাচ্ছেন, 'তুমি বড়, তুমিই যদি ভেঙে পড়, গোপী বেচারীর কী অবস্থা হবে বলতো?'

□

দুঃখের ছায়া নামলো বাড়িটিতে। বেশ কিছুদিন সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত রইল। দুঃখের যত শক্তি, প্রকৃতি মানুষকে তার চেয়ে অনেক বেশী সহন শক্তি দিয়েছেন। দুঃখের যেমন কোনো নিশ্চিত সীমা নেই. ঠিক তেমনি মানুষের সহন শক্তিও অসীম। যে দুঃখের কল্পনা মাত্র মানুষের অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে, সেই দুঃখই সহসা যখন বাস্তবে দেখা দেয়, তখন কে জানে কোথা থেকে সেই দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাও এসে যায়। হেসেই হোক বা কেঁদেই হোক, সেই দুঃখ সহ্য করে নিতেই হয়। দুঃখের ঘন কালো মেঘের ছায়ায় বসে মানুষ যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়, অশ্রুপাত করে। কেঁদে কেঁদে দুঃখ ভুলে যেতে চায়। তারপর একদিন মেঘ সরে যায়, খুশীর আলো জ্বলে আর মানুষ হেসে ওঠে। যে দুঃখ পেরিয়ে এসেছে তার কথা সে ভুলে যায় সে যে যন্ত্রণার্ত হয়ে কেঁদেছিল সে কথা তার মনে থাকে না। কিছু অসাধারণ মানুষ হয়ত ব্যতিক্রম, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে এটাই সত্যি।

গোপী তার মা-বাবা ও বৌদি সাধারণ মানুষ। ব্যথার অকূল সমুদ্রে দুঃখের প্রবল ঢেউ-এর আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকবছর কাটানোর পর তাদের মনে হল, দুঃখ ও ব্যথার প্রবল গর্জন যেন কিছু প্রশমিত। করুন-মধুর-স্মৃতির ছোট ছোট ঢেউ তাদের

ব্যথিত হৃদয়কে সান্ত্বনার করস্পর্শে সঞ্জীবিত করে সেখানে কিছু আশা ও কিছু সুখের মিহি একটি জাল বুনে চলেছে।

দেওর ও বৌদি একই দুর্ভাগ্যের শিকার। তারা বুঝতে পারে না কী করে একে অন্যকে সান্ত্বনা দেবে। বৌদি আগের মতোই পূজা ও ঘরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। যন্ত্রের মতো সে সব কিছু করে চলে, যেন এই কাজগুলি করার জন্যেই এই যন্ত্রের নির্মাণ হয়েছে। এই যন্ত্র একই গতিতে, এই ভাবেই কাজ করে চলবে। এই নিয়মের কোনো পরিবর্তন হবে না। চলতে চলতে যন্ত্র ক্রমশঃ পুরনো হবে, তার গতি মন্থর হয়ে আসবে, তারপর একদিন তার গতি রুদ্ধ হবে,—যন্ত্র চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বৌদি এখন অনেক গম্ভীর আর চুপচাপ হয়ে গেছে। সব সময় উদাস থাকে। পূজা ও ঘরের কাজ ছাড়া যেন তার জীবনে কিছুই নেই আর। গোপী বৌদিকে দেখে। সেই নিঃসীম উদাসীনতা, রুক্ষতা ও দুঃখ দিয়ে গড়া নিষ্প্রাণ পুত্তলিকাকে দেখে ভাবে, এইভাবেই কী এ এর জীবন কাটিয়ে দেবে? সে নিজেই কী বৌদিকে এইভাবে জীবন কাটাতে দেবে। পৃথিবীর উদ্যানে শীতের পরে বসন্ত আসে, বৌদির জীবনে শীতের এই রুক্ষতা কী চিরদিন থাকবে? চেষ্টা করেও কী বৌদির জীবনে বসন্ত আনা যাবে না? শীত আসার পর যে পাখি চুপ করেছে, সে কী আর কোনোদিন গান গাইবে না?

গোপী সমাজের রীতি-নীতির সঙ্গে পরিচিত। সে জানে তার সমাজে বিধবার অবস্থা সেই শুকনো কাঠের টুকরোর মতো, যা তার স্বামীর চিতার আগুনে পুড়তে থাকে, আর যতক্ষণ সে পুড়ে পুড়ে ছাই না হয়ে যায়, ততক্ষণ তাকে ছোঁবার অধিকার নেই কারুর। গোপী ভাবে, তার বৌদিও কী এমনি পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? সে কী কোনোদিন ঐ আগুন নিভিয়ে দিতে পারবে না? গোপীর মনে সারাক্ষণ একই প্রশ্ন জাগে। আর সে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। বৌদি আগেও তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল, কিন্তু বৌদির জীবন অন্তহীন শূন্যতায় ভরে যাওয়ার পরে সে গোপীর হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছে। গোপী নিজের কথা না ভেবে সর্বদা বৌদির কথাই চিন্তা করে,—স্নেহময়ী বৌদিকে কী করে আবার আগের মতো হাসিখুশী দেখবে, সেই তার একমাত্র চিন্তা।

□

পৃথিবীতে যাই ঘটে যাক, বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাপের মনে সর্বদা একই চিন্তা। গোপী জেল থেকে ফিরেছে এই খবর পাওয়া মাত্রই তারা আবার ছুটোছুটি শুরু করল। গোপীর জেল থেকে ফেরার অপেক্ষা ছিল শুধু। এবার বিয়ের কথা পাকা করতে আর

বাধা কিসের? কথা বলার জন্যে গোপীর বাপ তাদের ছেলের কাছেই পাঠিয়ে দেন। তিনি পঙ্গু মানুষ, সব ব্যবস্থা তো গোপীকেই করতে হবে। সে যেমন ভাল বুঝবে, তাই করবে।

গোপী তাদের দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। সে বুঝতে পারে না বৌদির সামনে সে আবার বিয়ে করবে কী করে। কোন চোখে বৌদি সেই খুশীর উৎসব দেখবে, কী করে বিয়ের গান শুনবে, কোন প্রাণে সব সহ্য করবে? না না, বৌদির ব্যথিত প্রাণে সে আর আঘাত দিতে পারে না। এমন হলে সে খুব দুঃখ পাবে।

গোপীর ইচ্ছে হয় চিৎকার করে ঐ লোকগুলোকে বলে, 'বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসতে তোমাদের লজ্জা করে না? কিছু না হোক অন্তত মানুষ হিসেবে আমাকে বোঝার চেষ্টা কর। বিয়ের কথা বলে আমার ক্ষত বিক্ষত মনে আর জ্বালা ধরিও না।' কিন্তু সৌজন্যতাবশত সে এসব কিছুই বলে না, শুধু বিয়ে করবে না জানিয়ে সে তাদের ফিরিয়ে দেয়। তারা তাকে প্রশ্ন করে সে এই সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছে। গোপী কোনো উত্তর দেয় না। সে কেমন করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ বোঝাবে তাদের? কেউ হয়ত প্রশ্ন করে, 'সারাটা জীবন এইভাবে কাটাবে কী করে?' গোপী তাকে জিজ্ঞেস করতে চায়, বৌদিও তো আমার সমবয়সী, সে কেমন করে কাটাবে? কিন্তু সে চুপ করে থাকে। আরেকজন বলে ওঠে, একদিন তো তোমাকে বিয়ে করতেই হবে।'—গোপী ওদের বলতে চায় এই কথা কী ওরা বৌদিকে গিয়ে বলতে পারবে? কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোয় না। প্রচণ্ড রাগে সে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। 'হ্যাঁ করতে তো হবেই। কোনো ছেলেপুলে থাকলেও না হয় কথা ছিল', আরেক ব্যক্তি বলে ওঠে। পাত্র চুপ করে আছে দেখে তারা ভাবে তাদের কথায় কাজ হচ্ছে। হয়ত রাজী হয়ে যাবে।

বৌদিরও তো ছেলেপুলে হয়নি। তার কী সেসবের প্রয়োজন নেই? গোপীর মনে এই মূক প্রশ্ন জাগে, যদিও তার ঠোঁট একটুও কাঁপে না। কিন্তু ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে, সে আর রাগ চেপে রাখতে পারছে না। 'বংশের নামটা টিকিয়ে রাখার জন্যে...' গোপী আর সহ্য করতে পারল না, সে গর্জন করে উঠল, 'আমার বংশ নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। তোমরা যেতে পার।'

'অদ্ভুত লোক! আমরা কী ভাবে কথা বলছি, আর ও কেমন করে উত্তর দিচ্ছে।' অপমান সহ্য করে নিয়ে তারা আবার বলে, 'দেনা-পাওনা নিয়ে যদি কোনো কথা থাকে...'

'না কোনো কথা নেই। কিচ্ছু না। আমি বিয়ে করব না, করব না, করব না।' গোপী সেখান থেকে উঠে চলে যায়।

কিন্তু বিয়ের কথাবার্তা বন্ধ হয় না। আর কোনো কন্যা কর্তার আসার খবর শুনলে সে পাগলের মতো হয়ে যায়। তার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে ওঠে। সে

নীরব ভাষায় প্রশ্ন করতে চায়, ' কেমন করে আমি আমার বিধবা বৌদির শূন্য দৃষ্টির সামনে বিবাহের আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করি? নিজের মনের যন্ত্রণার্ত কান্না লুকিয়ে রেখে, একটি অবোধ বালিকাকে নিয়ে এসে একটি সুখের সংসার গড়ে তুলি? না না, এ হতেই পারে না।' সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বারো

চরের জমিতে এবছর রবি-শস্যের ভালো ফলন হয়েছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে পাকা গমে ক্ষেত ভরে রয়েছে। দেখলে মনে হয় আকাশেই যেন লাল রং ধরেছে। ফসল কাটার আগে খবর পেয়ে দূর দূরান্ত থেকে স্ত্রী ও পুরুষ মজুরের দল এসে জমায়েত হয়েছে। অন্তত পনের কুড়ি দিন ধরে ফসল কাটা চলবে। মটরু পালোয়ান ভালো মজুরী দেয়। সে অন্য চাষীদেরও বলে দিয়েছে যে মজুরদের মজুরী দিতে তারা যেন কার্পণ্য না করে। মজুররা বোঁচকা ভরে ভরে ফসল নিয়ে যায়।

মা গঙ্গার পাড়ে যেন মেলা বসেছে। পেষাই কল, শাক-সবজী, ছাতু ও বিড়ি তামাকের ছোট ছোট দোকান বসেছে। গমের বদলে ওরা অন্য জিনিস দেয়। এখানে কারো কাছেই পয়সা থাকে না। রোজ সন্ধ্যায় যা মজুরী পায় তার থেকে নিজেদের প্রয়োজন মতো কিছু গম পিষিয়ে নিয়ে বাকী গমের পরিবর্তে তারা প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসে। দিনের বেলা সকলেই ছাতু খায়। রাত্রে রুটি সেঁকার জন্যে গঙ্গার ধারে যখন অনেকগুলি উনুন জ্বলে ওঠে, তখন ধোঁয়ার মেঘে আকাশ ভরে যায়।

এইসব দেখে মটরুর মন খুশীতে ভরে যায়। লোকগুলো মটরুকে এত সম্মান খাতির করে যে সে লজ্জা পায়। লোকে বলে, 'এ হলো মটরু পালোয়ানের এলাকা। দ্বিতীয় আর কে এমন বুদ্ধি আর সাহস রাখে যে জঙ্গলে মানুষের বসতি বসাবে? নদীর চর তো চিরকাল এমনি পড়ে থাকত, কাউকে কখনো দেখা যেত না সেখানে। এখন দেখো সেইখানেই যেন মেলা বসেছে। এতগুলো চাষী আর মজুরের পেট ভরছে। সকলে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছে তাকে। জমিদার চিরকাল জঙ্গল বিক্রী করে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেছে। মটরু পালোয়ানের আগে কেউ তার সামনে এসে দাঁড়ানোর সাহস করেনি। মটরুর মতো নির্ভীক লোক আর আছে না কী? হাজার হাজার মানুষ কী এমনিই তার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত? এই রকম লোকেরাই মানুষের মনে রাজত্ব করে। তাকে চোখ রাঙানোর সাহস এখন স্বয়ং জমিদারেরও হবে না।

□

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ আকাশে দেখা দিতেই মটরু ও পূজন মজুরদের ডাকাডাকি শুরু করে দিল। দিনের বেলা ওরা ধূলোর ঝড় ও গরমে অস্থির হয়। ভোরের ঠাণ্ডায় তারা দু-তিন ঘণ্টায় যতটা কাজ করে, দিনের আট দশ ঘণ্টাতেও ততটা কাজ হয়ে ওঠেনা। নদীর ধারে ঠাণ্ডা বালির উপর সার বেঁধে ঘুমোয় তারা, বড় মিষ্টি উত্তুরে হাওয়া বয়। চাঁদের আলো মধুর স্নিগ্ধতা ছড়ায় চারিদিকে। নদী মিঠে গান গেয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। ডাক শুনেই মজুর-মজুরনী সব উঠে পড়ে। বিন্দুমাত্র আলস্য থাকে না তাদের। নদীর হাওয়ার স্পর্শে তাদের ক্লান্ত শরীর আবার সজীব, সতেজ হয়ে উঠেছে। নিজেদের গ্রামে সারারাত ঘুমিয়ে যে আরাম ও বিশ্রাম এরা পেত, এখানে নদীর চরে দু চার ঘণ্টা ঘুমিয়েই তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়ে যায় এরা।

আগুন জ্বলছে। পাশেই তামাক আর খৈনী রাখা আছে। যারা তামাক খায় তারা কল্কে সাজাচ্ছে। যারা খৈনী খায় তারা তামাক ডলছে। কিছুক্ষণ বুড়ো বুড়িদের গলা ঝাড়ার শব্দে চারিদিক মুখরিত হল। তারপর ফসল কাটা আরম্ভ হল।

ক্ষেতের একদিকে মজুররা, অন্যদিকে মজুরনীরা সারিবদ্ধ হয়ে বসে ফসল কাটতে লাগল। ক্ষেতের এক পারে মটরু, অন্য পারে পূজন। পূজন নিকটবর্তী একটি বুড়িকে সামান্য ঠেলা দিয়ে হেসে বলল, 'একটা গান শোনাও না গো।' বুড়ি হেসে তার পার্শ্ববর্তিনীকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিল। শৃঙ্খলের মতো সমস্ত দলটি আন্দোলিত হল। তরুণীরা কেশে গলা সাফ করল। দু একবার 'তুই শুরু কর', 'তুই শুরু কর' বলার পর ধরিত্রী কন্যারা জংলী মধুর মতো মিষ্টি সুরে গান গেয়ে উঠল। সঙ্গীতের তালে তালে কাজও চলতে লাগল। ভোরের প্রসন্ন আকাশে চাঁদ, তারা নেচে উঠল, মা গঙ্গার ঢেউ উন্মত্ত হয়ে তটের উপর আছড়ে পড়তে লাগল।

প্রিয় আমার যেও না পরবাসে,
সেখানে কী পাবে তুমি
বল, কী পাবে?

গমের ক্ষেত সোনায় ভরা,
নাচছে যেন মাটির কানে ঝুমকো দু'টি দুল—
কাস্তে নিচ্ছি হাতে, আনন্দেতে,
দেবীর পায়ে অর্ঘ দেব ফুল।

খুশী হয়ে অন্ন দেবেন তিনি,
বিষাদ ভুলে ফসল তুলে.
ঝাড়ব, পিষব. মিঠাই বানাব আমি!

পিঁড়ি পেতে বসতে দেব তোমায়
নিজের হাতে তোমায় খেতে দেব।
মনে আছে গত বারের সময়?

সজনী আমার যেও না পরবাসে
সেখানে কী পাবে তুমি
বল, কী পাবে?

ঊষার সিঁদূর রং ধীরে ধীরে ক্ষেতের উপর ছড়িয়ে রঙিন ঝিলের মতো হেসে উঠল। মজুর-মজুরনীরা যেন সব সোনায় গড়া মূর্তি। নদীর জল সোনালী ওড়নার মতো ঝলমলিয়ে উঠল। শান্ত পরিবেশে মাঝে মাঝে দূর থেকে কোনো পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। আড়ামোড়া ভেঙে প্রকৃতি ঘুমভাঙা চোখ খুলছে। সূর্যের প্রথম কিরণ যেন তার অধর চুম্বন করেছে, আর সমগ্র চরাচর তাকে জীবন ও প্রেমের রাগিনী শোনাচ্ছে।

ঠিক তখনই মটরু শুনতে পেল, 'মটরু ভাই!'

মটরু চমকে তাকাল, আর ছুটে গিয়ে গোপীকে জড়িয়ে ধরল।

'গোপী, গোপী তুই কখন এলি ভাই?'

'এখন তো খুব জিজ্ঞেস করছ! চার পাঁচ মাস হল এসেছি, একটা খবরও তো নাওনি।' গোপী নালিশ জানায়।

'এত তাড়াতাড়ি এলে কী করে? আমি তো জানতাম তুমি এই মাসে ছাড়া পাবে।' গোপীর দুই হাত নিজের হাতে ধরে মটরু বলল।

'আরো ছ'মাসের ছাড় পেয়ে গেলাম। শুনলাম তুমি নিয়মিত আসা যাওয়া কর। একবারও এলে না কেন? আমি তোমারই অপেক্ষা করতাম। ভালো আছ তো?' গোপী জিজ্ঞেস করল।

'সবই মা গঙ্গার কৃপা। তুমি নিজের খবর বল। দেখো না, কাজ নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছি এখন।' গোপীকে নিয়ে নিজের ঝুপড়ির দিকে যেতে যেতে মটরু বলল।

'তুমি তো বলতে তুমি একলাই এখানে থাকো, এ তো দেখছি একটা ছোটখাট গ্রাম।' চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে গোপী বলল। মটরু হাসল। বলল, 'সবই মা গঙ্গার কৃপা। এখন অনেক চাষী এখানে ঘর বেঁধেছে। মটরু আর একলা নয়। তার এখন অনেক বড় সংসার।' বলেই সে হাসতে লাগল।

ডান হাতের কাঁধ পর্যন্ত খড়বিচালি মেখে লখনা ঝুপড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল, মটরু বলল, 'দেখছিস কী? তোর কাকা হয়, নে প্রণাম কর।'

লখনা প্রণাম করতে যেতেই গোপী তার হাত ধরে ওঠায়, 'তোমার ছেলে, না?'

'হ্যাঁ, মটরু বলে, 'কীরে, মোষ দুয়েছিস?'

'হ্যাঁ' মাথা নত করে ছেলেটি বলে।

'যা কাকার জন্যে এক ঘটি দুধ নিয়ে আয় তো। আর হ্যাঁ, তারপরেই ছুটে ক্ষেতে চলে যাস। আমার জায়গা ছেড়ে চলে এসেছি।' চাটাই পেতে গোপীকে বসতে দিয়ে মটরু বলে।

'আরে, আমি এখনও হাত মুখই ধুইনি।' গোপী বলে।

'বাঘে কখনও মুখ ধোয়? দুধ খাবে তার জন্যে আবার মুখ ধোবার কী দরকার?' মটরু হেসে বলল।

□

জেল ঘরের খবর শোনানোর পর গোপী বলল, 'প্রাণ সংকটে পড়েছি ভাই, তোমার মতামত জানতে এলাম। তুমি বাঁচাও তো প্রাণ বাঁচে। রোজ রোজ বাড়িতে লোক আসছে, বুঝতে পারছি না, কী করি। বৌদির অবস্থা তাকিয়ে দেখা যায় না। বড় কষ্ট হয়। তার চোখের সামনে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।'

'সত্যি কথা বলতে কী আমিও ঐ দোটানায় পড়েছি। ওখানে গেলেই মা আর বাবুজী তোমার বিয়ের কথা পাকা করতে বলেন। আর আমি এড়িয়ে যাই। যেদিন থেকে আমি তোমার বৌদিকে দেখেছি, সেদিন থেকে কোনো মেয়েই আর পছন্দ হয় না। ভেবেছিলাম তুমি এলে কিছু একটা স্থির করা যাবে। সত্যি কথা বলতো ভাই, তুমি কী তোমার বৌদিকে বিয়ে করতে চাও? আমার মনে হয় তুমি তাকে খুব ভালোবাস।'

'আমার চাওয়া না-চাওয়াতে কী এসে যায়?' গোপী উদাস কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'কেন এসে যাবে না? তুমি পুরুষ না? সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে মটরু একলা দাঁড়াবে তোমার সঙ্গে! আমাকে কী মনে কর? আমি তো একথাও ভেবে রেখেছি যে তোমার মা-বাপ যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেয়, তো আমার ঝুপড়ির কাছে আরো একটা ঝুপড়ি বেঁধে দেব। আর দেখছ আমার নতুন ক্ষেত! দুজনে মিলে মিশে কাজ করব। কোন শালা কী করবে আমার? সত্যি বলছি গোপী, তোর বৌদির কথা ভেবে আমারও বুক ফেটে যায়। তুই তাকে আপন করে নে ভাই! অনেক পুণ্য হবে তোর। কশাই-এর হাত থেকে পশু আর ব্যাধের হাত থেকে পাখিকে বাঁচালে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য হবে। বাহাদুর লোক এই অবস্থায় পালিয়ে যায় না।' গোপীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে মটরু বলে।

'কিন্তু ওর মনের কথাও তো জানতে হবে। কে জানে ও কী ভাবে। ও কী রাজি

হবে ভাই?' গোপী অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে।

'পাঁচমাস হল এসেছিস, এখনও সে কথা জেনে নিসনি?' মটরু আশ্চর্য হয়।

'কী করে জানব বল? ও তো একদম বোবা হয়ে গেছে। জলভরা চোখে এমন তাকিয়ে থাকে যেন শিকারীর হাতে পায়রা। আমি কী করে জানব ওর মনের কথা...।'

'এবার একদিন জিজ্ঞেস করেই দ্যাখ না।'

'কিন্তু মা, বাপু...'

'একটা কথা জেনে রাখ, মা-বাপুর কথায় যদি চলতে চাস তো কখনোই এই কাজ করতে পারবি না। রীতি-রেওয়াজ আর সংস্কার ওঁদের রক্তের ভেতরে ঢুকে গেছে। বংশের মান-মর্যাদার ধারণা ওঁরা চিরকাল বুকে ধরে রাখেন। বাঁদরগুলো তাদের বাচ্চাকে কেমন বুকে জড়িয়ে রাখে দেখিসনি? এঁদের অবস্থা ঠিক সেই রকম। এই ব্যাপারে ওঁদের রায় নিতে যাস না। অল্প বয়সী তুই, তোর ভয় কিসের? আমি তো তোর সঙ্গেই আছি। তোর বিরুদ্ধে কেউ কিছু করুক দেখি। আরে সাহস চাই সাহস। সাহসের সামনে সমস্ত পৃথিবী মাথা নীচু করে।'

'তুমি কবে আসবে বল? মা-বাপুকে একটু বোঝাবে। ওরা বড় তাড়া দিচ্ছেন।'

'চার পাঁচ দিনের মধ্যেই যাব। ফসল কাটা শেষ হলেই। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। তুই শুধু তোর বৌদিকে বুঝিয়ে রাজী কর। চল, তোকে ক্ষেত দেখাই। ওখানেই গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে ফিরব।'

তেরো

বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে অনেক লোক এসে একে একে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। তারপর একদিন সকালে বৌদি যখন পূজায় মগ্ন, মা এসে গোপীকে ডেকে নিয়ে তার বাপের সামনে উপস্থিত করল। বাপ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। গোপী বুঝে উঠতে পারল না কী ব্যাপার। বাপ তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমার আর তোমার মায়ের অবস্থাটা দেখেছ?' গোপী ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল।

'আমাদের কি কিছু ঠিক আছে বাবা? আজকের দিনটা কোনো রকমে কাটলো তো কাল কী হবে জানিনা। মনে কত কী আশা ছিল, এখন সে সব ভাবলে বুক ফাটে। যাক, ভগবানের যা মর্জি ছিল, তাই হয়েছে। এবার তুই কী চাস যে এইরকম ভাঙাচোরা সংসার ফেলেই আমরা...' বলতে বলতে আবেগে, দুঃখে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। মা আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠেন।

গোপীর যন্ত্রণার্ত হৃদয়ে কেউ যেন নির্দয় আঘাত করে। সমগ্র অন্তরাত্মা হাহাকার

করে ওঠে। নিজেকে সামলাতে না পেরে সে সেখান থেকে সরে আসার চেষ্টা করে। বাবা আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'আমরা থাকতে থাকতে তুই যদি সংসার পাতিস, তাহলে অন্তত শান্তিতে...' গোপী আর কিছু শুনতে পেল না। বাইরের চাতালে এসে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। তাকে কেউ কেন বুঝতে পারে না? কারুর মেয়ের বিয়ের চিন্তা, কারুর বংশের নাম রেখে যাওয়ার চিন্তা, মা-বাপের ভাঙা সংসার নতুন করে পাতার চিন্তা। তার মনকে বোঝার চেষ্টা কেউ কেন করে না?

ভাবতে ভাবতে সে অস্থির হচ্ছিল আর অস্থির হয়ে বার বার ভাবছিল। শেষ পর্যন্ত সে একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয়। চরম উত্তেজনাময় এই মুহূর্তে সমাজ-সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে সে দৃঢ়তার সঙ্গে সংকল্প করে যে ঘর বাঁধবে,—নিশ্চয়ই ঘর বাঁধবে, কিন্তু এমন ভাবে ঘর বাঁধবে যাতে তার হৃদয়ের এই যন্ত্রণারও উপশম হবে আর বিধবা বৌদির নীরস জীবনেও সরসতার ছোঁয়া লাগবে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় যখন মা বাপের ঘরে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলেন, গোপী পূজোর ঘরে বৌদির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত। বৌদি পূজোয় নিমগ্ন। রামায়ণ পাঠ করছে... 'যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সন্মুখে...' একই পংক্তি বার বার পড়ছে। তার দু চোখে অশ্রু ঝরছে।

গোপীর মন করুণায় ভরে ওঠে। তার দুচোখও অশ্রুসিক্ত হয়। পূজা শেষ হলে আঁচলে চোখ মুছে বৌদি বিগ্রহকে প্রণাম করে। তারপর চরণামৃত পান করে উঠেই সামনে দেওরকে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার চক্ষু বিস্ফারিত হয়, পরক্ষণেই সে চোখ নত করে। জেল থেকে ফেরার পর গোপী একবারও বৌদির চোখের দিকে তাকাতে পারেনি। একান্তে কখনো দেখাও করেনি। বৌদি চকিতা হরিণীর মতো একবার গোপীর দিকে তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করল; গোপী প্রাণের সমস্ত সাহস একত্র করে কম্পিত হাতে তার হাত ধরে ফেলে। বৌদি আর্তনাদের মতো ডেকে ওঠে, 'বাবু!'

গোপীর মুখ আরক্ত। আবেশে কম্পিত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না বৌদি।'

বৌদি তার দেওরকে ভাল.করেই জানে। তার একটা কথা, একটা ব্যবহারে সে তার মনের সব কথা বুঝতে পারে। তার শূন্য চোখে খুশীর একটি ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে কান্নাভেজা স্বরে বলল, 'আমার ভাগ্যে তো এই লেখা আছে বাবু।' আবেগ ও কান্না রোধ করতে সে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'আমি ওসব ভাগ্যতে বিশ্বাস করিনা বৌদি। আমি শুধু আমার আর তোমার দুঃখকে জানি। এই দুঃখী জীবন কী আমরা একসঙ্গে কাটাতে পারি না? দুজন দুঃখী মানুষ কী একটা সুখের সংসার গড়তে পারে না?' গোপী দুই চোখে সাগ্রহ নিবেদন নিয়ে বৌদির দিকে তাকায়। বৌদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার মুখে আশা ও নিরাশার

দ্বন্দ্বে ভরা করুণ হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে, 'এমন কখনো হয়নি বাবু, এমন কোনোদিন...'

'কখনো হয়নি বলে, কোনোদিন হতে পারে না এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। বৌদি! আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি এ ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় রাস্তা নেই। তোমাকে এই অবস্থায় রেখে আমি জীবনে এক মুহূর্তও শান্তি পাবো না।' গোপী নিজের মনের কথা জানিয়ে চোখ নীচু করে।

তার হৃদয়ের এই আকুতি যে বৌদি বুঝতে পারেনি এমন নয়। গোপী তাকে চিরকাল আন্তরিক ভালোবেসেছে। আর সেই ভালোবাসার নির্ভরতায় সে আজও একটি অসম্ভবকে হৃদয়ের গভীরে আঁকড়ে ধরে আছে। বৃশ্চিক তার শরীরে সন্তানকে পালন করে; এই সন্তানই একদিন তার মৃত্যুর কারণ হবে জেনেও তাকে নিজের থেকে পৃথক করে না তো! বৌদিও, মৃত্যু অনিবার্য জেনেও, সেই অসম্ভবকে এক মুহূর্তের জন্যেও মন থেকে আলাদা করতে পারেনি। আজকের এই মুহূর্তটির জন্যে সে যেন কত যুগ ধরে প্রতীক্ষায় ছিল। কতবার সে মনে মনে ভেবেছে যে এইরকম সময়ে সে কী বলবে। কিন্তু যখন সত্যিই সময় এল, তখন তার মনে হল যে মনের কথা মুখে আনলেই সে দেওরের কাছে ছোট হয়ে যাবে। মনে হল, মনের কথা মনেই লুকিয়ে রাখতে হবে। গোপী তার অসহায় অবস্থা বুঝতে পারে, বুঝতে পারে যে গোপীর আন্তরিক স্নেহ, ভালোবাসা, সহানুভূতির ভার সে আর বহন করতে পারছে না। গোপী এ কথাও বুঝতে পারে, যে এ ব্যাপারে একমাত্র সে নিজেই কিছু করতে সক্ষম। বৌদির পক্ষে তার এই নিবেদন প্রত্যাখ্যান করা, এতদিনের স্নেহসূত্রের বন্ধন ছিন্ন করা কী সম্ভব? এত কিছু জেনেও সে কেন কিছু শুনতে চাইছে, কেন তাকে অপদস্থ করতে চাইছে?

দ্বিধায় পড়ে বৌদি বলে, 'আমাদের সমাজ, আত্মীয়স্বজন মা-বাপ এমন কখনো হতে দেবে না বাবু!'

'এইসব তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও বৌদি। আমি শুধু জানতে চাই, যে পথে আমি চলব বলে স্থির করেছি, সে পথে তুমিও আমার সঙ্গী হবে কী না।' গোপী বৌদির হাত নিজের দুহাতে সজোরে আঁকড়ে ধরে তার দিকে তাকায়। হৃদয়ের সমগ্র আকুতি ছিল তার সেই দৃষ্টিতে, যেন একটি উত্তরের উপর তার জীবন মরণ নির্ভর করছে।

বৌদির ঠোঁট কেঁপে উঠল। মনের কথা ঠোঁটের কাছাকাছি এসে চঞ্চল হল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বৌদি কিছু বলতে পারল না। মনে যে ঝড় উঠেছিল তাকে সংযত করতে সে তার স্পন্দিত, রক্তাভ মুখ নত করে নিল। গোপী যেন তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। বৌদিকে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হল তার। কিন্তু ব্যগ্র হাত অগ্রসর হওয়ার আগেই, নিজেকে সংযত করে, বৌদির হাত ছেড়ে দিয়ে সে সবেগে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ বিগ্রহের চরণে উন্মুক্ত

করে, বৌদি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল—'ভগবান! ভগবান! একী সত্যি...?'

গোপী মা-বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাপ তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'গম ঝাড়াই আর কত বাকী, বাবা?' 'আজ শেষ হয়ে গেল।' 'আচ্ছা যা, হাত মুখ ধুয়ে নে। তোর বৌদির রুটি সেঁকা হলে গরম গরম খেয়ে নে। সারাদিন খেটে ক্লান্ত হয়ে গেছিস।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'ফসল কাটা হয়ে ঘরে এলে চাষীর সারা বছরের পরিশ্রম সার্থক হয়। সেদিন সে পরম নিশ্চিন্ত।'

'বাবা।'

বাপ ছেলের দিকে ফিরলেন, 'কিরে, কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলবি বল না।'

'বাবা, এবার আমি বিয়ে করব।'

'এ তো খুব খুশীর কথা বাবা। যেদিন তুমি ফিরেছ, সেদিন থেকে এই কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি। কালই করতে পারিস। বিয়ে ঠিক করতে কত দেরী হবে? কত লোক এসে ফিরে গেল। আর হ্যাঁ, মটরু অনেকদিন আসেনি। সে বলছিল, 'আমিই গোপীর বিয়ে দেব।' ভুলে গেছে হয়ত। ফসল ঝাড়াই-এর সময় এখন, চাষীর কী অন্য কিছু ভাবার সময় আছে? যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোকে কিছু চিন্তা করতে হবে না।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে খুশী ভরা গলায় বললেন, 'ক্ষেতের ফসল কাটা হয়ে ঘরে এলে, চাষীর মনও ক্ষেত থেকে ঘরের দিকে ফেরে। কী বল গোপীর মা, ঠিক না?'

গোপীর মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আঁচল দিয়ে আদরের ছেলের মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'সে কথা ঠিকই। ঘর ভরলেই পেট ভরে, আর পেট ভরলেই...' কথা অসমাপ্ত রেখে গোপীর মা সজোরে হেসে ওঠে, বাপও সেইসঙ্গে যোগ দেয়।

'কিন্তু বাবা...' মাথা নীচু করে, হাত কচলে গোপী বলে।

'কিচ্ছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বংশে মেয়ে দিতে সকলেরই লোভ। এখনও কিছুই হারায়নি আমার। তুই নিজের পায়ে দাঁড়াবি, সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে। সেই দেখতেই তো আমি এখনও বেঁচে আছি। কী বল, গোপীর মা?'

'তা নয়তো কী? আমার বাছা ভালো থাক, ঘর আমার ভরে যাবে। হে ভগবান!' বুড়ি দু হাত জড়ো করে কপালে ঠেকায়।

'কিন্তু বাবা', ঢোক গিলে, শুকনো গলায় গোপী বলে, 'আমি...আমি...আমি...বাবা, আমি অন্য মেয়েকে এ বাড়িতে আনব না। আমি ঠিক করেছি বৌদিকে...'

'কী?' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাবা চিৎকার করে ওঠেন। দুচোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। মা জমে পাথর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ হাঁ, চক্ষু বিস্ফারিত। বাপ

গর্জন করে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে এ কথা যদি আর কখনো উচ্চারণ করিস; তো...তো...তুই শুনে রাখ, সে আমার ঘরের বৌ, কিন্তু সে চিরকাল মাণিকের বৌই থাকবে। তুই যদি...ওঃ...মাণিকের মা...' রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর শরীর কাটা গাছের মতো পড়ে গেল, আর তিনি দুই হাঁটুতে হাত রেখে কঁকিয়ে উঠলেন। মা জ্বলন্ত চোখে একবার গোপীর দিকে তাকিয়ে স্বামীর হাঁটুতে ধীরে ধীরে মালিশ করে ব্যথা উপশমের ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। বুড়োর চিৎকার শুনে অনেকেই ছুটে এসেছিল। বৌদিও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। গোপী দুহাতে নিজের কপাল টিপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

□

সকলেই মনে করে ছেলে আর বিধবা পুত্রবধূ মা-বাপের নয়নের মণি। বুড়ো সকলকে বলত, 'বৌ আমার ঘরের লক্ষ্মী। হলই বা বিধবা, ওর জন্যেই তো প্রাণে বেঁচে আছি। ওর সেবার প্রতিদান কী এ জীবনে দিতে পারব? পূর্বজন্মে ও নিশ্চয়ই আমার মেয়ে ছিল, পরজন্মে ওর মেয়ে হয়ে জন্মে আমি ওর সেবা করব। তবে তো ঋণমুক্ত হ'ব।' আর মা? 'ও আমার নয়নের মণি। ঐ তো আমার মাণিক। বড় বৌ একদিন এই সংসারের কর্ত্রী হবে। সকলে ওকে মাথায় করে রাখবে।' গোপীকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি তার হৃদয়ে বৌদির স্থান কোথায়। ওঃ, ওদের জ্বলন্ত চোখ গোপীকে ভস্ম করল না কেন? কেন বৌদিকে পুড়িয়ে ছাই করল না? কেন সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বাড়িটা জ্বালিয়ে দিল না? সব ঝঞ্ঝাট মিটে যেত তাহলে। দুই বুড়োবুড়ি বসে থাকত এই মহাশ্মশানে।

গোপীর সারা শরীর ও মনে অসহ্য জ্বালা। ওর ইচ্ছে করছিল সকলকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে বৌদির হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দু একবার চাতাল ছাড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়িয়েও আবার পিছু হটল। দাঁতে দাঁত চিপে অনেক চিন্তা করল। কিন্তু মা-বাপের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসার সাহস ছিল না তার। এমন দিন তার জীবনে আসতে পারে এ কথা সে কখনো ভাবেনি। তার ধারনা ছিল যে সে মা-বাপের একমাত্র আদরের সন্তান, তার মনের ইচ্ছা জানালেই...

অসহায় ক্রোধে পাগলের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। তার ভয় করছিল যে সত্যিই সে কিছু একটা না করে বসে।

সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। নিজের মনের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করে সে একটা মীমাংসায় পৌঁছেছিল, কিন্তু সব ব্যর্থ হল। বাবার একটা মাত্র কথায় তার এতদিন ধরে গড়ে তোলা প্রাসাদ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এক নতুন পথ ধরে চলতে চলতে সে যখন গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, তখন কেউ যেন তার

গতিরুদ্ধ করে দিল। দুঃখের চেয়ে বেশী রাগ হচ্ছিল তার। বুকের মধ্যে ক্ষোভ জমেছিল তার মা-বাপের বিরুদ্ধে। প্রাচীন রীতি-নীতি, সমাজরে অর্থহীন কতগুলো নিয়ম, পচা গলা সংস্কার আর বংশের মিথ্যে মর্যাদার ফাঁকা দম্ভের পূজারী তার মা-বাপ তাদের নিষ্ঠুর হাতে ফুলের মতো পবিত্র, নিরীহ, দুর্বল, আর ভোরবেলার শুকতারার মতো একা একটি অসহায় তরুণীকে নিষ্পিষ্ট করে দিতে চান। আহ! নিজের চোখের সামনে নির্দয়তার এই ক্রূর দৃশ্য সে সহ্য করবে কী করে?

ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক আর ক্ষুব্ধ হৃদয় নিয়ে বৈরাগীর মতো, ফসল কাটা ফাঁকা ক্ষেতখামারে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল গোপী। এখন শুধু মটরুর কথাই মনে পড়ছে, যার কোলে মাথা রেখে সে একটু শান্তি পেতে পারে। এবার যা করার সে-ই করুক। বৌদির মনের কথাও তার অজানা নেই। ইচ্ছে করছিল এক্ষুনি ছুটে মটরুর কাছে চলে যায়। তারপর বাড়ির কথা মনে এল,—কে জানে আজ কত নির্যাতন হবে বৌদির। গোপী বাড়ির দিকে ফিরল। চারিদিক নিস্তব্ধ। অন্ধকার রাত সবকিছু ঢেকে ফেলেছে। চোরের মতো চুপি চুপি দালানে উঠতেই মায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল। আহত বাঘিনীর মতো মা গর্জন করছেন, পোড়ারমুখি, দেওরের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে লজ্জা হল না তোর? মনে করতাম কী সতী-সাবিত্রী বৌ আমার। কত ঢংই দেখিয়েছে। পূজো-আর্চা, ধ্যান-ভক্তি, সেবা-শুশ্রূষা! কী করে জানব এই সবের আড়ালে তুই আমার মুখে চুণকালি লাগানোর চেষ্টা করছিস। ডাইনি! এই পাপ কাজ করতে তোর লজ্জা হল না? মনে যখন এত পাপ, কোনো কুলাঙ্গারের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেই তো পারতিস। নিজের মুখে কালি মাখতিস,—আমার ছেলেটা অন্তত তোর খপ্পর থেকে বেঁচে যেত। কত সম্বন্ধ এল আর গেল। আমি ভাবি, ব্যাপার কি, ছেলে কোনো কথা কানে নেয় না কেন? কী করে জানব ভেতরে ভেতরে তুই কী বেহায়াপনা করছিস! বুড়োটা পঙ্গু, নইলে তোকে আজ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলত। নিজের পাপের ফল পেতিস। ডুবে মরতে পারিস না, রাক্ষুসী!...'

গোপী আর শুনতে পারল না। তার মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল, আর কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সে এমন কিছু করে বসবে যার ফল খুব ভয়ানক হবে। এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে গিয়ে সে বাড়ির পাশে কূয়ার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাওয়া মাথা দু হাতে চেপে ধরে সেইখানেই পড়ে রইল সে। তার হৃদয়ে শুধু হাহাকার।

□

এই ধরণের কথা বৌদিকে আজ পর্যন্ত কোনোদিন শুনতে হয়নি। অতীতের দিনগুলো একে একে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল,—সে যেন এক মৃত্যু পথযাত্রী। মা-

বাবা, ভাই বোনের আদর, মাণিকের প্রেম, শ্বশুর-শাশুড়ি-দেওরের স্নেহ। বিধবা হওয়ার পর শাশুড়ির সঙ্গে তার খিটি মিটি লাগত, কিন্তু এই ধরণের কথা বলার সুযোগ সে কোনোদিন কাউকে দেয়নি। আজও তো তার কোনো দোষ ছিল না। কিছু না জেনে শুনে, না ভেবে চিন্তে শাশুড়ি তাকে যে সব কথা শোনালেন, তা' শোনার পর তার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তীব্র যন্ত্রণায় হৃদয় হাহাকার করে উঠল। সহসা এই অকারণ আঘাতে সে কেমন নিশ্চল হয়ে গেল। কিছু বলতে পারল না, কাঁদতে পারল না, একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলল না। মাথা ঘুরছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে নেশাচ্ছন্ন, নির্জীব হয়ে পড়ছিল। চেতনা ও অবচেতনার মাঝখানে এক নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো সে বসে রইল। শাশুড়ি সমানে বকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার কানে কিছুই আর পৌঁছাচ্ছিল না। তার অবচেতন মনের গভীরে শাশুড়ির একটা কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, 'ডুবে মরতে পারিস না, রাক্ষুসী!'

মরবার কথা সে আগে কতবার ভেবেছে, কিন্তু একমাত্র ভরসা, একটাই আশা তাকে মরতে দেয়নি। এতকাল যতই অসম্ভব হোক, তবু একটা আশা তো ছিল। কিন্তু আজ? আজ আর সে আশা নেই। যে তারাটির দিকে তাকিয়ে সে বেঁচে ছিল এতদিন, সে তারাও খসে পড়ে গেছে। এখন শুধু অন্ধকার, অন্ধকার, নিবিড়, কঠোর, ভয়ংকর অন্ধকার। বক্‌বক্ করতে করতে শাশুড়ি খাটে শুয়ে পড়লেন, আর বকবক করতে করতেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। অসম্ভব রাগে সকলের খাওয়া-দাওয়া, বুড়োর ওষুধ খাওয়া, ছেলের খোঁজ খবর, এমনকি বাইরের দরজা বন্ধ করতেও মনে রইল না তাঁর।

রাত গভীর হল। চারিদিক নিস্তব্ধ। নির্জনতাও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, তার শ্বাস-প্রশ্বাসও থেমে গেছে যেন।

অচেতনার অতল অন্ধকারে ডুবে থাকা বৌদির চেতনায় যেন কিছু আলোড়ন হল। সে নীরব, নিথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল, তার নিশ্চল পা এবার উঠল। বৌদি এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসার পর কোনোদিন বাড়ির বাইরে যাওয়ার সিঁড়িতে পা রাখেনি। কিন্তু এখন সে অন্য মানুষ। প্রাণহীন এক শরীর যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে জ্ঞানও নেই তার।

এই তো কূয়ার ধারে চলে এসেছে সে। আর দু পা গেলেই...

'কে?' অতন্দ্র প্রহরীর মতো গোপী তখনও জেগে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখে সে ডেকে উঠল।

অচেতন প্রাণে সহসা চেতনা ফিরে আসে। বৌদি ছুটে কূয়াপাড়ে এসে পড়তেই গোপী তাকে ধরে ফেলল, 'কে? বৌদি তুমি?' বৌদি তার হাতের উপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এই ভবিতব্য ছিল! গোপীর হঠকারিতার এই পরিণাম! এখন সময় নেই। শিগ্গির! ভাববার সময় কোথায়, মূর্খ!

গোপী বৌদিকে দু হাতে উঠিয়ে ছুটতে শুরু করে। অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। গোপী তবু ছুটে চলে। রাস্তা দেখার সময় কোথায়? ঐ চণ্ডালদের হাত থেকে সরিয়ে বৌদিকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে হবে।

চোদ্দ

ভোরের আলো ফোটার আগেই গোপী আবার কূয়োর ধারে এসে শুয়ে পড়ে। সে তার অস্থির হৃদয়কে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, এমন সময় মায়ের চিৎকার কানে এল, 'হায় ভগবান, বড় বৌ বাড়িতে নেই!' গোপী চোখ বুজে পড়ে রইল, যেন সে ঘুমোচ্ছে।

ধীরে ধীরে প্রতিবেশী নারী পুরুষ বাড়িতে ভীড় করল। গোপীকে জাগান হল। এক হত্যাকারীর মতো সে চুপ করে বসে রইল। প্রতিবেশীরাই ভেবে চিন্তে ভীড় সরাল, আর পরামর্শ দিল চুপ করে থাকতে। কাক-পক্ষীতেও যেন কিছু টের না পায়। বদনাম তো হবেই, তাছাড়া আরো অন্য ঝামেলা হতে পারে।

কিন্তু এইভাবে কথা লুকিয়ে রাখা যায় না। এইসব খবর প্রচার করাতেই বহুলোক আনন্দ পায়। কাজেই ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দারোগা এসে উপস্থিত হলেন।...

দারোগা চলে গেলেন। গোপী চাতালে একলা বসে চিন্তায় ডুবে ছিল। মায়ের কান্নার শব্দে তার রাগ বেড়ে যাচ্ছিল। মা কেন কাঁদছেন সে বুঝতে পারছিল না। তিনিই তো বৌদিকে ডুবে মরতে বলেছিলেন। এখন এই অভিনয়ের কী প্রয়োজন? তার ইচ্ছে করছিল মায়ের কাছে গিয়ে তার গায়ের জ্বালা মেটায়। তাকে বলে, 'যাক খুব বেঁচে গেলে, মুখে আর চুণকালি মাখতে হল না। কী আনন্দ! এবার তোমার বংশ মর্যাদার ঢাকটা খুব জোরে জোরে পেটাও!' বাপকেও কথা শোনাতে ইচ্ছে করছিল, 'এখন খুব সম্মান বাড়ল তো তোমার! প্রাণ ঠাণ্ডা হয়েছে তো? তুমি খুনী, এই পাপের ফল তোমাকে পেতেই হবে। সমাজ আর আত্মীয়-স্বজনের মালা গেঁথে তুমি গলায় পর আর নীতি-নিয়মের মন্ত্র জপ করো।'

কিন্তু রাত্রের ঘটনা তার মন ও মস্তিষ্কে এমন ভাবে ভরে ছিল যে সে স্থানুর মতো বসেই রইল। অনেক চিন্তার পর তার মনে হচ্ছিল যে মা-বাপের চেয়ে সে নিজেও কম অপরাধী নয়। বৌদির এই পরিণতির জন্যে মা বাপের মতো সে নিজেও সমান দায়ী। সাহস করে, মা-বাপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সর্ব-সমক্ষে সে যদি বৌদির হাত ধরতে পারত, তাহলে বৌদির এই পরিণাম হত না। এই একটাই চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, আর সে নির্বাক হয়ে গেছিল। তার মনে হচ্ছিল, সত্যিই তাদের সমাজে বিধবা

নারী এক অবহেলিত বস্তু, স্বামীর চিতার আগুনে যা জ্বলতে শুরু করে, আর সারাজীবন জ্বলতেই থাকে। সে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার আগে সেই আগুন নিভিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই কারো। ছাই হয়ে যাওয়ার আগে সে বৌদিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, সে কী তার অনধিকার চেষ্টা? তার সহানুভূতি, তার প্রচেষ্টার কী এই পরিণাম? কী ত্রুটি ছিল তার সেই চেষ্টায়? বৌদি তো শেষ করতেই চেয়েছিল নিজেকে। আকস্মিক যোগাযোগে তার প্রাণ রক্ষা পেল, তা' না হলে... তা' না হলে গোপী ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। হায়! কী হয়ে যেত! হে ঈশ্বর, তুমি পরম করুণাময়...

একটাই প্রশ্ন বার বার মনে জাগছে, এমন কেন হল? কেন, কেন? তারপর নিজের অন্তর থেকেই সে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায়, 'তুমি সত্য ছিলে গোপী, চেষ্টাও করেছিলে; কিন্তু এই চেষ্টাকে সফল করে নিজের গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্যে যতটা সাহস প্রয়োজন ছিল,—সেই সাহস তোমার ছিল না। তোমার এই সাহসের অভাবই বৌদিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সাহসহীন প্রচেষ্টার পরিণাম আর কী হতে পারে? আগুনকে তা শুধু আরো প্রজ্জ্বলিত করে। ওরে মূর্খ, একবার বোঝার চেষ্টা কর। জীবন কোনো ছেলেখেলা নয়। ব্যর্থ ভাবালুতার আবেগে ভেসে যাওয়া স্রোত নয়। আগুনে লাফিয়ে পড়ে আগুন নেভাতে হবে। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি বিধবার রক্তপান করে বলিষ্ঠ, সামাজিক রীতি-রেওয়াজের ভয়ঙ্কর রাক্ষসটার সঙ্গে একলা লড়াই করে তাকে হারাতে হবে। গহণ অরণ্যে নির্মাণ করতে হবে এক নতুন পথ। এ কোনো ছেলেখেলা নয়।

গোপী জীবনে কোনোদিন কারো কাছে হার মানেনি। তার মনে হল, কেউ যেন তার শক্তি ও সাহসকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করছে। তার পরাজয় হলেই বৌদির মৃত্যু অনিবার্য। জোখু পালোয়ান তাকে প্রথমবার ডাক দিয়েছিল, আজ দ্বিতীয় আহ্বান। গোপী অনুভব করল আবার সেই রক্ত তার শিরায় শিরায় দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছে, যার ক্ষমতার কাছে সে সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করে।

□

কুয়ায় কাঁটা ফেলা হল। তালপুকুরে খোঁজা হল। যখন কোথাও কিচ্ছু পাওয়া গেল না, তখন নানান গুজব ছড়াতে লাগল। মনগড়া অনেক গল্প তৈরি হল। মেয়েরা বৌদির নানান কুলক্ষণ নিয়ে আলোচনা করল। বুড়োরা যুগের দোষ দিল। গোপীর বন্ধুরা এই নিয়ে চর্চা করে প্রচুর আনন্দ পেল। অবশ্য এদের কারুরই এমন সাহস ছিল না যে গোপীর সামনে কিছু বলে। নিজেদের ত্রুটি লুকিয়ে রেখে কতদিন আর পরের ছিদ্রান্বেষণ করা যায়? জলে নুড়ি ফেললে যে তরঙ্গভঙ্গ হয় তার মেয়াদই বা কতটুকু?

দিন কাটতে লাগল। পৃথিবী আবার আগের মতোই চলতে লাগল।

একদিন রাত্রে সমস্ত গ্রাম যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, গোপীর দরজায় মোটা লাঠির ঠক ঠক শব্দ হল। আজকাল বুড়োর খুব গভীর ঘুম হয় না। সে চোখ খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

আগন্তুক মৃদু হেসে বুড়োর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'জেগে আছ, বাবুজী?' 'কে? মটরু না? আর বাবা, যেদিন বৌ চলে গেল সেদিন থেকে আমার চোখে আর ঘুম নেই। এখন মড়ার মতো পড়ে থাকি। তার মতো সেবা আর কে করবে? বুড়ি তো একটুতেই রেগে যায়। এখন ভগবান তুলে নিলেই বাঁচি। এসো বসো। অনেক দিন পরে এলে। এর মধ্যে কত কী হয়ে গেল। ভেবেছিলাম এবার সুদিন ফিরবে। কিন্তু অদৃষ্টে আরো কত ভোগান্তি বাকী ছিল।

দেওয়ালের গায়ে লাঠি রেখে, পায়ের কাছে এসে বসে মটরু বলে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, বাবুজী। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার বাড়ির কথা ভেবেই তো রাত দিন এক করছি। ভেবেছিলাম, যতক্ষণ কাজ শেষ না হয় কোন মুখ নিয়ে আসব আপনার কাছে। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম। যতক্ষণ সেই কথা না রাখতে পারছি মনে শান্তি পাবো না। কী করব, এই এক দোষ আমার। স্বভাব তো বদলাতে পারি না। মা গঙ্গার জল, মাটি আর হাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুতেই সুখ পাই না। হ্যাঁ, অধিকার আর ন্যায়ের চেয়ে কোনো কিছুকেই বড় ভাবিনা। মুখ থেকে কেড়ে খেয়েও জমিদারের পেট ভরে না। এত সহজে মুখের জিনিস দিয়ে দেওয়া যায় না, বাবুজী। অনেককাল এইভাবে কেড়ে খেয়েছে ওরা। এখন আর পাচ্ছে না, তাই খেপে যাচ্ছে। শুনছি কানুনগো আসছেন খোঁজ খবর করতে। এখন চারদিকে শুধু জল আর জল। কীসের খোঁজ করবে? পরের বছর করবে হয়ত। ততদিনে আমরাও তৈরি হয়ে যাব। প্রাণ দেবো, কিন্তু জমিদারকে আর পা রাখতে দেবো না ওখানে। এখন কয়েক বছর লড়াই চলবে। মা গঙ্গার কৃপায় আমাদেরই জিৎ হবে। ন্যায় আর অধিকার তো আমাদেরই। মিথ্যা, ধাপ্পাবাজী, ছলনা আর জোরজুলুমের গাড়ি বেশীদিন চালানো যায় না। এখন মটরু আর একা নয়, অনেক চাষীবন্ধু তার সঙ্গে রয়েছে। মাটির জন্যে যারা প্রাণ দিতে পারে, তাদের কাছ থেকে মাটি ছিনিয়ে নেওয়া কী সোজা কথা?...এইসব ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছিলাম বাবুজী। তা না হলে এতদিনে সব ঠিক হয়ে যেত। মা গঙ্গা ফুলে উঠেছেন। পাঁচদিন আগেই নিজের ঝুপড়ি ওপারে নিয়ে গেছি। এপারে জমিদার কুকুরের মতো সর্বদাই আমার গন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এবার তুমি বল। এখানকার খবর অনেকদিন পাইনি।...'

'কী বলব বাবা, বাড়িতে কাজকর্ম করতে একজনই ছিল, সেও...'

'সে কথা শুনেছি, বাবুজী।'

'কী বলব মটরু, এত ভালো বৌ ছিল আমার যে তার কথা মনে পড়লে বুক

ফেটে যায়। আর বাঁচব না আমি।' বলতে বলতে বুড়ো কেঁদে ফেলে।

'দুঃখ কোরো না, বাবুজী। এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, গোপীর জন্যে এমন বৌ এনে দেব যে একই সঙ্গে বড় বৌ আর ছোট বৌ, দুজনেরই অভাব পূর্ণ করবে। তুমি চিন্তা কোরো না।'

'গোপী কী রাজী হবে? সে আমাদের উপরে খুব রেগে আছে। কথাই বলে না। তোমার কাছে কিছু লুকোবো না, সে নিজের বৌদিকে নিয়েই সংসার পাততে চেয়েছিল। সে কী করে হয় বল? কে জানে পাগলি বুড়িটা বৌকে কী বলেছিল যে বৌ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এদিকে ছেলেও রেগে আছে। আমরা কী তার মনের খবর জানতাম? জানলে কী আর বাধা দিতাম? মা-বাপের কাছে ছেলের চেয়ে বড় কী আর কিছু? দুটো নয়, চারটে নয়, একটা মাত্র ছেলে। ওর ভরসাতেই বেঁচে আছি। আত্মীয়রা কী আমাদের খাওয়াবে? কী করে জানব বল? এখন এত আফসোস হচ্ছে। মেয়েটা চলে গেল। ওর মতো সেবা কে করবে আমার? এখন আর কী করা যায় বল? তুমি একটু বোঝাও ওকে, তুমি বোঝালে যদি বোঝে।'

'বোঝাব, বাবুজী।' আমার কথা ও ফেরাতে পারবে না। আমাকে ও বড় ভাই-এর মতো মান্য করে। তুমি চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় আছে ও?' উঠতে উঠতে মটরু বলে।

'আর একটু বোসো, বাবা। আমাকে তো বললেই না কোথায়...' মটরু মুচকি হেসে বলল, 'বাড়িরই মেয়ে বাবুজী। আমার ছোট শালি বলতে পারেন। পণ্ডিতকে দেখিয়ে নিয়েছি। কুষ্টি-টুষ্টি সব মিলেছে। রঙে-রূপে গোপীর বৌদির মতোই। বেশী তো কম নয়। গুণেও সেইরকম। সকলের দেখাশোনা, সেবাযত্ন, এমন ভালোভাবে করে তোমাকে কী বলব। তুমি দেখো, মনে হবে বড় বৌ বুঝি অন্যরূপ নিয়ে ফিরে এল। ভাববে, আমি কী করে এমন মেয়ে খুঁজে পেলাম। গোপীর বৌদিকে দেখার পর আর কোনো মেয়েই আমার মনে ধরত না। যাকে-তাকে কী নিয়ে আসা যায়? এ তো দৈবের যোগাযোগ যে ঠিক ঐ রকম মেয়ে বাড়িতেই পেয়ে গেলাম। ওরা দোজবরের হাতে মেয়ে দিতেই চাইছিল না। ঠিকই তো, এমন রূপবতী, গুণবতী মেয়ের বিয়ে দ্বিতীয় পক্ষে দেবেই বা কেন? তারপর মটরুর অনুরোধ বলে ফেরাতে পারল না। মটরুকে কেউ ফিরিয়ে দেয় না, বাবুজী। তবে হ্যাঁ, বাড়ির মেয়ে হলে কী হবে, আমি ওদের পরিস্কার বলে দিয়েছি, পণ যা চাইবে, দিতে হবে। তুমিও লজ্জা কোরো না। যা যা চাই সব বলে দাও।' 'আমরা আর কী চাইব? এসব কথা তুমি গোপীর কাছেই জেনে নিও। আমাদের আর কী বাবা, যাতে সবাই খুশী, আমরাও তাতেই খুশী। ছেলেটা সংসারী হোক, ভগবানের কাছে শুধু এই প্রার্থনা। যা, ভেতরে গোপীর কাছে যা। ওর সঙ্গে কথা বলে নে। আর বাবা, যত তাড়াতাড়ি হয়, সব কাজ করে ফেল। আর দেরী সহ্য হচ্ছে না। হে ভগবান...' 'আমি সব ব্যবস্থা করেই

ফেলেছি, বাবুজী', বলে মটরু উঠে লাঠিতে বাঁধা পুঁটলিটি খুলে বুড়োর হাতে দিয়ে বলল, 'এই যে আশীর্বাদের মিষ্টি, ধুতি আর পাঁচশো টাকা।' 'না-না-এত তাড়াতাড়ি সব কী করে হবে? পুরোহিত, আত্মীয়স্বজন?'

'ও সবের ব্যবস্থা তুমি কর। আমি তো এক রাতের অতিথি। মা গঙ্গা ফুলে উঠেছেন। পারাপারের ঝামেলাও রয়েছে। কে আর রোজ রোজ ছুটে আসবে? আর তুমি এসব নিয়ে নিলে গোপীর উপরে জোর করাও যায়। আমার কাজটা একটু সহজ হয়। এমনিতে কাজ তো তোমারই। যাই গোপীকে আশীর্বাদ করে আসি। জয় মা গঙ্গা।' সে উঠে পড়ল।

গোপী তার ঘরে খাটে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মটরু তার হাত ধরে টেনে ওঠাবার চেষ্টা করে বলল, 'কী রে, তোর বিয়ের চিন্তায় এত রাতে নদী পার হয়ে এখানে এলাম, আর তুই নাক ডাকাচ্ছিস? দাঁড়া, আসুক তোর বৌ, তারপর দেখব কী করে নাক ডাকাস।'

গোপী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বলল, 'চাতালে চলো, মটরু ভাই।'

'কেন, এখানে কী হয়েছে রে?...ও, লজ্জা পাচ্ছিস বুঝি? তুই তো আইবুড়োদেরও হার মানালি।' গোপী তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। মটরুর হাতের লাঠিটা দরজার কাছে রেখে গোপী বলল, 'আমার...' 'চুপ কর, আমার কাজ আমাকে আগে করতে দে।' বলে বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল রগড়ে, মন্ত্রের মতো বিড় বিড় করে কিছু বলে গোপীর কপালে ছোঁয়াল। গোপী বলল, 'এটা তুমি খেলা মনে করেছ নাকী?'

মটরুর হাসি মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তুই খেলা বলছিস? বাহাদুর লোকের কাছে যে কোনো কঠিন কাজই খেলা, আর কাপুরুষের কাছে সহজ কাজও কঠিন মনে হয়। তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস সে খেয়াল আছে? মটরু তার জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো কাজকেই কঠিন ভাবেনি। বিপদের সঙ্গে সে সর্বদাই খেলা করেছে, আর খেলতে খেলতেই বিপদকে পেরিয়ে গেছে। তুই এমন কথা আর কখনো বলিস না। এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র কাপুরুষদের ঘৃণা করি আমি। যেদিন মনে হবে তুই কাপুরুষ, সেদিন তোকে আর তোর বৌদিকে কেটে ফেলে মা গঙ্গাকে ভেট দেবো। মনে করব আমার একটা ভাই ছিল, মরে গেছে।' মটরুর গলা ভারী হয়ে এল। সে মাথা নীচু করল। গোপী তার কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মটরু তার পিঠে হাত রেখে বললো, 'পাগল, আমি থাকতে কোন কাজ তোর কঠিন মনে হয়? ওঠ, আমার কথা শোন, সময় বেশী নেই। রাত থাকতেই ফিরতে হবে আমায়। গোপীকে উঠিয়ে তার গালে মৃদু চাপড় মেরে বলল, 'সিসবন ঘাটের কাছে আমার নৌকো থাকে। তুই বললেই ওরা তোকে আমার ঝুপড়িতে পৌঁছে দেবে। আমি আমার লোকেদের বলে রাখব। তোর কোনো অসুবিধে হবে না। আশীর্বাদের

জিনিস আমি বাবুজীর হাতে দিয়েছি। ঐ হলুদ ধুতি কাল পরিস। আত্মীয় স্বজনদের মিষ্টি পাঠিয়ে দিস। প্রথা মতো যেন সবকিছু হয়। বর সেজে আমার বাড়িতে আসিস। বরযাত্রী আনিস না। আনলেও বেশী লোক সঙ্গে নিস না। মা গঙ্গা এখন রেগে আছেন। যাক, যা বুঝবি, তাই করিস। আমার বোনের বিয়ে, দরকার হলে নিজেকেও বেচে দেব। মা গঙ্গা আবার আমার ঝুলি ভরে দেবেন। তাঁর দরবারে কোনো অভাব নেই, বুঝলি? দুশ্চিন্তা করিস না। ভুলে যাস না, তুই আমার ভাই। এমন কাজ করবি যাতে মটরুর সম্মান বাড়ে। বাহাদুর লোকেই আমার সম্মান বাড়াতে পারে। কথাগুলো মনে রাখিস। সিসবন ঘাট। এখন চলি?

'আমার বৌদি কেমন আছে?' সপ্রেম কণ্ঠে গোপী প্রশ্ন করে। মটরু হাসে, বলে, 'এখনও ও তোর বৌদি? 'কনে' বলতে পারিস তো। ভালো আছে, খুব ভালো আছে। মা গঙ্গার হাওয়া গায়ে লাগলে তাপ জুড়োয়। এখন এত সুন্দর হয়েছে, দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবি না। এর মধ্যে সময় পাস তো একবার ঘুরে আসিস।' গোপীর কপালে চুম্বন করে মটরু উঠে পড়ে। গোপী সহসা তার পা জড়িয়ে ধরে। মটরু বলে, 'হ্যাঁ, বড় শালার খাতির করতে শেখ।'

'দাদা', গোপী লজ্জায় মাথা নীচু করে। মটরু তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে।

পনেরো

মোষকে খোল ভূষি খাইয়ে মুখ অন্ধকার করে বিলরা ফিরতেই বুড়ো তাকে বলে, 'দৌড়ে গিয়ে পুরোহিতকে ডেকে আন তো। তোর সঙ্গেই আসতে বলিস। দেরী করে না যেন।'

'কেন বাবু? কোনো সম্বন্ধ এসেছে? ছোটবাবুর কী বিয়ে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে গেছে। তুই তাড়াতাড়ি ডেকে আন।' বিলরা চলে যায়। এই খুশীর কাজে যেতেও তার কোনো উৎসাহ ছিল না। ছোট মা যেদিন হারিয়ে গেলেন, সেদিন বড় দুঃখ হয়েছিল তার। গোপী আসার পরে ছোটমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। খোলভূষি গোপীই বার করে দিত। তার কতবার মনে হয়েছে ছোটবাবুকে সে মনের কথা খুলে বলে। কতবার তাকে একা পেয়ে একথা তার মুখেও এসেছে, সে কিছু বলতে চায় বুঝতে পেরে গোপী জিজ্ঞেসও করেছে। কিন্তু তারপরে সে এড়িয়ে গেছে। তার আর সাহস হয়নি। ছোটমা স্ত্রীলোক, তার কাছে বলা সোজা ছিল। কিন্তু গোপীর কথা আলাদা। সে যদি রাগ করে দু একটা থাপ্পড় লাগায়। ক্ষত্রিয়ের রাগ কেমন সে ভালো করেই জানে। ছোটমা হারিয়ে যাওয়ার পর তার মনে

হয়েছিল, 'ইস, কী নিষ্ঠুর এই লোকগুলো! বেচারীকে তাড়িয়ে তবে শান্তি পেয়েছে।'

ছোটমার কথা তার খুব মনে পড়ে। কে জানে বেচারী কোথায় আছে এখন। হয়ত নদী বা পুকুরেই ডুবে মরেছে। এই সরলপ্রাণ লোকের সমবেদনা ছিল তার মনে। তা না হলে ছোটমার সঙ্গে তার কীসের সম্বন্ধ? কিন্তু সত্যিই, তার কথা ভেবে সে যত দুঃখ পায় এরকমটা আর কেউই পায়না।

এরা কত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেল। যেন কিছুই হয়নি। তার চলে যাওয়ার পর কটা দিনই বা কেটেছে, আর এরা বিয়ের তোড়জোড় শুরু করেছে। কত আনন্দ হবে। বাজনা বাজবে। কী স্বার্থপর এই পৃথিবী। নিজের সুখের চেয়ে অন্যের দুঃখকে কেউই বড় করে দেখে না।

বিলরা যখন পুরোহিতকে নিয়ে ফিরল তখন দরজায় প্রচুর হৈ-হট্টগোল। আত্মীয়স্বজনকে খবর পাঠাতে তাঁরা এসেছেন, কিন্তু সবকিছু না জেনে তারা বিবাহে অংশগ্রহণ করবে না। কোথাকার মেয়ে, তার মা-বাপের কোন বংশ, রক্ত কেমন, হাড় কেমন? আশীর্বাদের জিনিস রাত্রে এসে দিয়ে গেল কেন? থেকে গেল না কেন? এরকম ভাবে কখনো কারুর পাকা দেখা হয়?

গোপী একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বুড়ো দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। পুরোহিতকে দেখে কাছে ডাকলেন ও পাশের খাটিয়াতে বসতে বলে প্রশ্ন করলেন, 'পণ্ডিতজী, আমি কী অন্ধ? নিজের বংশমর্যাদার খেয়াল নেই আমার? এরা আমাকে সেই কথা মনে করাবে? সুযোগ-সুবিধা ছিল না, তাই মটরু সিং রাত্রে থাকতে পারেনি। কনে তার শ্যালিকা। কত বার বলছি, কত বোঝাচ্ছি, কত মিনতি করছি, এদের জেদ কিছুতে কমছে না। পঙ্গু হয়ে পড়ে আছি, এরা তাই মেজাজ দেখাচ্ছে। এরা ভুলে গেছে আমি কে।'

'আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আমরা সবাই সমান। জেনেশুনে কেউ যদি কাদায় পড়ে। পণ্ডিতজী, আপনিই বলুন, এটা বিয়ে না ঠাট্টা?' একজন বলে ওঠে।

পুরোহিত জানে কোন পক্ষ সমর্থন এই মুহূর্তে লাভদায়ক। তিনি কেশে, গলা ঝেড়ে বললেন, 'আপনাদের কথা ঠিকই। কিন্তু ভাই সব অবস্থার জন্যে বিধান তো স্বয়ং ঈশ্বর দিয়েছেন। আপনারা তো জানেন, বর যদি অসুস্থ হয়ে বিয়ে করতে আসতে না পারে, তখন তার ব্যবহৃত যে কোনো একটি বস্তুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়। দরকার মতো উপায় খুঁজে বার করতেই হয়। কোনো কারণে মটরু সিং থাকতে পারেনি, তারজন্যে কী বিয়ে ভেঙে দিতে হবে? আমার তো এই মত, এখন আপনারা যা ঠিক মনে করেন।'

আত্মীয়রা নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করলেন। এক বুড়ো বলল, 'পণ্ডিতজী, আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটনা অন্যরকম। এ তো বিয়ে নয়, আশীর্বাদ। আর আশীর্বাদ পিছিয়ে দেওয়া যায়। বিয়ের লগ্ন তো

ফাগুন মাসে। এখনও চার পাঁচ মাস দেরী আছে।'

'কী করে পিছিয়ে দেব? এই ধুতি, মিষ্টি, টাকা সব ফিরিয়ে দেবো?' বুড়ো গর্জন করে ওঠে।

'নিশ্চয়ই, তাই তো উচিত ছিলো।' একজন বলে। 'আর আমি যে তাকে কথা দিলাম?' বুড়ো প্রশ্ন করে। 'তাতে কী? তুমি তো আর রাজা হরিশচন্দ্র নও।' কেউ একজন ঠাট্টা করল! বুড়ো আর সহ্য করতে পারল না। সে কাঁপতে কাঁপতে গর্জন করে উঠল, 'কে এই কথা বলল? আর একবার বলুক তো দেখি। যদি আসল রাজপুত বাপের ব্যাটা হই তো তার জিভ ছিঁড়ে ফেলব। ওরে গোপী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অপমান সহ্য করছিস? ওদের একটু জানিয়ে দে তোর বাপকে মিথ্যেবাদী বলার ফলটা কী হয়।'

আত্মীয়মহলে মুহূর্তের স্তব্ধতা, তারপরেই কোলাহল শুরু হয়। 'ও কে যে আমাদের জিভ ছিঁড়বে? এ আমাদের সকলের অপমান। ওঠো! ওঠো! চলো। গালাগালি শুনতে কেউ এখানে আসেনি। আত্মীয়মহলে আমরা সবাই সমান।...আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! ওঠো! চলো!'

পুরোহিত হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। আত্মীয়েরা সব উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধুতি-টুতি ঝেড়ে নিয়ে, রাগত চোখে তাকাতে তাকাতে সেখান থেকে চলে গেলেন। বুড়ি এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, গায়ের জ্বালা মেটানোর সুযোগ পেতেই সে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, 'যাও যাও! তোমরা না হলে কী আমাদের ছেলের বিয়ে হবে না? পণ্ডিতজী, পূজোর জোগাড় করুন। ওদের চোখ রাঙানীকে ভয় করি না। আজেবাজে লোকেরা হয়ত ভয় পায় এদের। কিন্তু এটা মাণিকের বাপের বাড়ি, সে একাই একশো। কী মনে করেছে এরা?' 'আপনি ঠিক বলেছেন, এ তো রীতিমতো অন্যায়। পুরোহিতের কথা মানতেও রাজী নয় এরা। আপনাদের আর কী ক্ষতি হবে? কিছু খরচ বেঁচে যাবে। যার কেউ নেই, তার ভগবান আছে। কোনো কাজ কারুর জন্যে আটকায় না।' বলে পুরোহিত পূজোর জোগাড় শুরু করলেন।

এই তামাশায় বিলরা সবচেয়ে খুশী হল। এইসব আত্মীয় পরিজনের ভয়েই তো ছোটমাকে হারাতে হয়েছে। আত্মীয়ের ভয় যদি না থাকত তাহলে কোনো বিধবার জীবন ব্যর্থ হত না। তারা সকলেই নতুন ঠিকানা খুঁজে পেত, সকলেই সুখী হত। একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো বিলরা খুশী হচ্ছিল, তারই যেন জিৎ হয়েছে।

পুরোহিতকে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করে গোপী হলুদ রঙের ধুতি পরে চাতালে বসে ভাবছিল। যাক, যা হলো ভালোই হল। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। রাস্তার একটা পাহাড় সরে গেল।

বিলরা এসে কাছে বসল। গোপী তাকে দেখে বলল, 'কী ব্যাপার? খুব খুশী

মনে হচ্ছে?'

'তোমার আত্মীয়দের পালাতে দেখে খুব ভালো লাগছে আমার।' হাত কচলে বিলরা বলল।

'ভালো লাগার কী আছে তাতে?' গোপী প্রশ্ন করে।

'বাঃ, ভালো লাগার কথা নয়? এদের ভয়ের জন্যেই তো ছোটমা হারিয়ে গেল। এদের ভয় না থাকলে কী বাড়ি ছেড়ে চলে যেত?' বিলরা উদাস হয়ে বলে।

'হ্যাঁ, এটা অবশ্য তুই ঠিকই বলেছিস।' গোপী অন্যমনস্ক ভাবে বলল।

'তুমি আত্মীয়দের ভয় পাও বাবু?'

'হ্যাঁ'

'কিন্তু আজ তো ওরা সব সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। আগেই যদি দিত তাহলে আর ছোটমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হত না। আগেই কেন দিলো না বাবু?' ব্যথিত কণ্ঠে বিলরা প্রশ্ন করে। গোপী বিলরার এই প্রশ্নে আশ্চর্য হল। এই নীচুজাতির গ্রাম্য লোকটির কাছে এমন কথা সে আশা করেনি। সে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিলরাই আবার বলল, 'কে জানে কোথায় আছেন। তাঁর কথা বড় মনে পড়ে বাবু। এত ভালো ছিলেন উনি। তাঁর কথা মনে পড়লে বড় কষ্ট হয়।' বলে সে কেঁদে ফেলে। গোপী সস্নেহ কণ্ঠে বলে, 'ভগবান যেন তোর মতো মন সকলকে দেন। তুই দুঃখ করিস না। ভগবান সব ঠিক করে দেবেন। তুই কাঁদিস না।' 'বাবু', ফুঁপিয়ে উঠে বিলরা বলে, 'যখন ছোটমাকে দেখতাম, তখন মনে হত তোমার সঙ্গে তাঁকে কেমন সুন্দর মানায়। বাবু, আত্মীয়দের ভয় না থাকলে তুমি তো তাকে বিয়ে করে নিতে, তাই না?'

গোপীর মন দুলে ওঠে। সে বিহ্বল হয়ে বিলরার হাত ধরে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'তুই বড় ভালো মানুষরে বিলরা। যা, সকাল থেকে বাড়ি যাসনি, তোর বৌ চিন্তা করছে। মায়ের কাছে গিয়ে খাবার চেয়ে নে।'

ষোলো

খোঁজখবর কী করার আছে যে করবে? অন্য সব চালাকির মতো, চাষীদের ভয় দেখানোর জন্যে এটা জমিদারের নতুন চাল। মা গঙ্গার কী অপূর্ব মায়া, এ বছর জল সরে যেতে, নদীর দুটি ধারা তৈরি হল, আর দুদিকের দুই ধারার মাঝখানে নতুন জমি বেরিয়ে এল। মটরু জানত এ বছর জোরদার লড়াই হবে। তারজন্যে সে সবরকমে

প্রস্তুত ছিল। আর যখন নদীর দুটি ধারা দেখতে পেল, তখন তার মনে হল স্বয়ং মা গঙ্গা যেন তাঁর দুটি বিশাল হাতে দুদিক দিয়ে ঘিরে, তাকে আগলে রেখেছেন। শত্রু এখন শত চেষ্টা করেও তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

বালির উপরে প্রথমে মটরুর ঝুপড়ি, তারপর দেখতে দেখতে গতবছরের মতো পঞ্চাশেরও বেশী ঝুপড়ি তৈরি হল। জমিদার ভেবেছিলেন এ বছর কোনো চাষী আর চরের জমিতে যেতে সাহস পাবে না, তাঁর কানে যখন খবর পৌঁছল, তিনি তখন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। থানা, তহসিল, জিলা অফিসে ছুটোছুটি শুরু করলেন। এতদিন চুপ করে থেকে তো দেখলেন, এভাবে বসে থাকলে সেই পুরোনো সুখের দিন কখনো ফিরে আসবে না। এবার কিছু করতেই হবে, তা' না হলে চরের জমি চিরকালের জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই শেষ চেষ্টা,—হয় হার, নয় জিৎ। এস পার কী ওস পার, কিছু একটা করতে হবে।

খুব নরম আর ভিজে মাটি কিছু কিছু জায়গায় কাদা থকথক করছে। শুকোতে দেরী হবে। দু পাশে খরস্রোতা নদীর ধারা। গম লাগানোর জন্যে জমি তৈরি হতে অনেক দেরী। আরো অপেক্ষা করলেও জমি তৈরি হবে কী না বোঝা যাচ্ছে না। মটরু চিন্তায় পড়ে গেল। চাষীরাও চিন্তিত,—কী করা যায়। এ বছরটা কী বৃথা যাবে?

জমির বিষয়ে পূজন মটরুর চেয়ে অনেক বেশী জানত। সে নদীর ধারে ছোট একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে কিছু ধানের বীজ ছড়িয়ে দিল। পাঁচ ছ' দিন পরে যখন সেখানে সবুজ সবুজ অঙ্কুর দেখা দিল, তখন সে মটরুকে বলল, 'দাদা, ধান লাগালে কেমন হয়?' মটরু হেসে প্রশ্ন করলো, 'ধান কী এই সময়ে লাগায়?' পূজন নিজের গবেষণার কথা জানিয়ে বলল, 'শুনেছি পশ্চিমবাংলা আর মাদ্রাজে ধানের ফসল বছরে কয়েকবার হয়। আমাদের জমি এখন ধান লাগানোর মতোই হয়েছে। জলের কোনো অভাব নেই। জমি অনেকদিন নরম থাকবে। আমি বলছি দাদা, ধান লাগানো হোক। চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে তো ভালো। যদি কিছু না হয়, না হ'ল; আর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে একটা নতুন জিনিস শিখব।' মটরু তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল আর পূজনের সঙ্গে গিয়ে গর্তের ভেতরে গজানো ধানের চারা দেখল। তার চোখ উজ্জ্বল হল। সে বলল, 'সত্যি রে, তুই ঠিক বলেছিস।'

চাষীদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল। সকলেই পূজনের কথা মেনে নিল। ধান চাষের তোড়জোড় শুরু হল।

□

মটরু গোপীকে আসতে বলে এসেছিল, কিন্তু সে একবারও আসেনি। মাঝিদের কাছে

সর্বদাই খবর দেওয়া নেওয়া করত,—কিন্তু নিজে কখনো আসেনি। ফাল্গুনের নবমীতে লগ্ন। বরযাত্রী পাঁচ দশজনের বেশী হবে না। আত্মীয়রা মেলামেশা বন্ধ করেছে। সে সব নিয়ে কোনো চিন্তা নেই।

বৌদি একদিন মটরুকে জিজ্ঞেস করে, 'দাদা, তুমি তাকে আসতে বলেছিলে তো?'

'হ্যাঁ'

'কিন্তু সে তো আসেনি। তুমি মিথ্যে বলছ না তো?'

'মিথ্যে বলব কেন? কী করে আসবে বল তো?'

'কেন?'

'বিয়ের আগে কোনো বর কী শ্বশুরবাড়িতে যায়?' বলে মটরু হেসে ফেলে।

'ধ্যুৎ! যাও দাদা, তুমি খালি ঠাট্টা করো, আর এদিকে আমার মনে কত যে চিন্তা...'

'কেমন হবে আমার বর? মোষের মতো কালো না চাঁদের মতো ফর্সা?'

'হ্যাঁ, এই প্রথম দেখব কী না!'

'তাহলে?'

'জানিনা ভাগ্যে কী আছে। তোমাদের এসব তামাশা আমার ভালো লাগছে না।'

'এখানে দরজা খুললেই মা গঙ্গা। কূয়ায় ডুবে মরলে নরকে যেতিস, এখানে মা গঙ্গার কোলে গিয়ে পড়লে সোজা বৈকুণ্ঠে পৌঁছে যাবি।' বলে মটরু আবার হেসে ওঠে।

'তোমরা কী আমাকে তা করতে দেবে? যখনই ভাবি আবার ঐ বাড়িতে গিয়ে না জানি কোন দুরাবস্থায় পড়ব, তখন বড় ভয় করে। মনে হয়, তার চেয়ে মরে যাওয়াই সহজ।'

'আবার ঐ কথা? এই ভাই থাকতে তোর চিন্তা যায় না কেন পাগলি? এবার নিজের নতুন সংসারের কথা ভাব,—একটা নতুন জীবন শুরু হবে তোর। আমরা দুজনে তোর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তোকে কেউ কিছু বলবার সাহস করুক দেখি! তোকেও একটু সাহসী হতে হবে। সাহস না থাকলে পুরোনো প্রথা ভাঙা যায় কী?'

'তোমরা যে আমাকে কী বন্ধনে বাঁধছ।'

'ভালোবাসার বন্ধন না থাকলে মানুষের বেঁচে থেকে কী লাভ বল? ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম। হীরামন পাখির গল্প। একজন লোকের প্রাণ ঐ হীরামন পাখির মধ্যে ছিল। যখন হীরামন মরল, তখন ঐ লোকটাও মরে গেল। ঐ রকম আমারও মনে হয় যেদিন তুই মরবি, সেদিন আমিও মরে যাব।

'দাদা', বৌদি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এমন কথা মুখেও আনবে না।'

'তুইও এমন কথা মুখে আনিস না, বুঝলি?' বলতে বলতে মটরুর চোখ জলে ভরে ওঠে, 'জীবন বেঁচে থাকার জন্যে। পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার

নামই জীবন। বিষাদগ্রস্ত হয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায় না।

'যদি পুরুষ হতাম...'

'না নারী হয়েই। তবেই তো লোকের কাছে তোর প্রশংসা করে বলব, আমার একটা বোন আছে যার আমার চেয়েও বেশী সাহস।'

'তোমার কাছে যখন থাকি, তখন একটুও ভয় করে না।'

'মা গঙ্গার আশ্রয়ে এলে সব ভয় পালিয়ে যায়, এখানকার জল হাওয়াতেই এমন কিছু আছে। লখনার মা আগে খুব ভীতু ছিল। যখন থেকে এখানে এসে রয়েছে সব ভয় ছু-মন্তর হয়ে উড়ে গেছে। এখন দেখছিস তো, কেমন ভাবে থাকে।'

'হ্যাঁ, দেখছি। দাদা, তুমি কিছুদিনের জন্যে আমার সঙ্গে যাবে তো?'

'কেন, গোপীর উপর ভরসা হয় না?'

'হয়, কিন্তু তোমার উপর যতটা হয় ততটা হয় না।'

'লখনার মা', মটরু হাঁক দিয়ে বলে, 'এ কী বলছে শুনছিস? এ তো তোর সতীনের মতো কথা বলছে।' লখনার মা ঘরের এক কোণে বসে দই ফেটিয়ে মাখন তুলছিল। সেখান থেকেই জবাব দিল, 'এমন সতীন পেলে তো মাথায় করে রাখি। নে বোন, মাঠাটা তোর দাদাকে দে। কিছু না খেয়েই বেরিয়ে পড়বে। আজকাল কিছুই মনে থাকে না ওর।' বৌদির হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে মটরু ঢক ঢক করে সবটুকু মাঠা খেয়ে নিয়ে বলে, 'আচ্ছা চলি, একটু কাজ আছে। লগ্নের আর কুড়ি পঁচিশ দিন বাকী। পূজনকে শহরে পাঠাতে হবে।' এই বলে সে 'ও গঙ্গা মা তোমাকে ওড়নায় সাজাবো...' গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়।

□

মা গঙ্গার ছড়ানো আঁচলে ধানী রঙের ছোপ ধরেছে। দেখে দেখে চাষীদের বুক আনন্দে ভরে ওঠে। এত ভালো ধান হয়েছে যে গম না লাগাতে পারার আফসোস নেই আর। গমের চেয়ে অনেক বেশী ধানের ফলন হবে। মা গঙ্গার কত যে লীলা তাঁর আঁচলে কত কী যে রয়েছে, সে কথা কে জানে? এই মৃত্তিকার সেবা যে করবে, মা গঙ্গা তার দু হাত ভরে দেবেন। পরিশ্রম কখনো বিফলে যাবে না।

পূজন শহর থেকে এসে পোঁটলাটা বোনের সামনে রাখে। সে তখন রান্নাঘরে মটরুকে খেতে দিচ্ছিল। বৌদি এক ধারে বসে কুলোয় গম ঝাড়ছিল।

মটরু মুখের গ্রাস গিলে নিয়ে স্ত্রীকে বলল, 'খুলে দেখতো কী কী এনেছে।' তারপর বৌদির দিকে ফিরে ডাকল, 'আয়, তুইও আয়। তা' না হলে তোর বৌদি একাই সব নিয়ে নেবে।' বৌদি এসে দাঁড়াতে লখনার মা পোঁটলা খুলল। নতুন রুপোর গহনা ঝকমক করে উঠল। লখনার মায়ের চোখ খুশীতে উজ্জ্বল,

সে একটা একটা করে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। মনের উচ্ছ্বাস চেপে বৌদিও ঝুঁকে পড়ল। কঙ্কন, তোড়া, হাঁসুলি, বাজুবন্ধ,—গহনাগুলি বেশী ভারী নয়, কিন্তু প্রত্যেকটা এক জোড়া। লখনার মা জিজ্ঞেস করল, 'জোড়া আনিয়েছ কেন সবগুলোর? এতসব...'

'কেন? আমাদের বাড়িতে গয়না পরার দুজন রয়েছে না?' মটরু জবাব দেয়।

'দাদা', বৌদি চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমার জন্যে কেন আনিয়েছ?'

'ভাইয়ের বাড়ি থেকে খালি গায়েই শ্বশুরবাড়ি যাবি? লোকে দেখে কী বলবে? পাগলি, তুই কেন বুঝিস না, আমার কোনো মেয়ে নেই, আর এখন...' আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হওয়ারও কোনো আশা নেই। তোকে দিয়েই মেয়ের সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি। এ তো কবে থেকেই গয়নার কথা বলছে, আজ তোর ভাগ্যে ওরও গয়না হল। পছন্দ হয়েছে তো?'

তখনই বাইরে একটি চাষীর গলা শোনা গেল, 'পালোয়ান ভাই, ফুলচনকে গ্রেপ্তার করেছে। একটা লোক এসেছে খবর দিতে। বলছে...'

অর্দ্ধেক খাবার ফেলে মটরু উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাড়ির বাইরে অনেক চাষী ভিড় করেছে। সকলের মুখে চিন্তার ছাপ। জিজ্ঞেস করায় যে লোকটি খবর এনেছিল সে বলল, 'ফুলচনের বাবা মাঝির মুখে খবর পাঠিয়েছে যে আজ দুপুরে ফুলচন ওদের গ্রামে গ্রেপ্তার হয়েছে। ওর অসুস্থ মাকে দেখতে আজ সকালেই ও গ্রামে গিয়েছিল। দুপুরে দশজন পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তারা বলছিল, চরের জমির মামলায় একশো জনের নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। জমিদার ফৌজদারী মামলা করছে।'

সবাই শুনে নির্বাক। জমিদার যে কিছু করবেই একথা সবাই জানত, কিন্তু হঠাৎ এইভাবে ওয়ারেণ্ট বেরোবে একথা কেউ ভাবেনি। মটরু একটু ভেবে বলল, 'সব নৌকো এপারে আনিয়ে নাও। ওপারে যেন একটাও নৌকো না থাকে। এপারে নৌকো প্রস্তুত রাখো। সকলকে বলে দাও, কেউ যেন গ্রামে না যায়। লাঠি প্রস্তুত রাখো। সকলকে সজাগ থাকতে হবে। সিসবন ঘাটে একটা নৌকো পাঠিয়ে দাও। ওখানকার খবর আনার জন্যে। আর হ্যাঁ, ফুলচনের ছেলে মেয়েরা কোথায়?'

'ওরা নিজেদের ঝুপড়িতেই আছে। বসে বসে কাঁদছে সব।' একজন বলল।

'চলো, ওদের দেখি', এগিয়ে যেতে যেতে মটরু বলল, 'সিসবন ঘাটে কে যাচ্ছে? কোনো চালাক লোককে পাঠাও। গ্রামেও আমাদের যে সব লোক রয়েছে, তাদের তৈরি থাকতে বলতে হবে। জমিদার এবার রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাবে।'

সতেরো

পরদিন এক এক করে সব ঝুপড়িগুলি তুলে ঝাউ-এর জঙ্গলে সরিয়ে ফেলা হল। নদীর তীরে পাহারা বসানো হল। খবর পাওয়া গেল যে পুলিশ রোজ গ্রামে একবার টহল দিয়ে যাচ্ছে। চরের চাষীরা জানত যে যতক্ষণ তারা এই চরে আছে, কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই কেল্লায় এসে কোনো শত্রু প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না। সবাই খুব সাবধানী হয়ে গেল। কেউ আর নিজেদের গ্রামে যায় না। প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যদিক দিয়ে নদী পার হয়ে বিহারের হাট থেকে কিনে আনা হয়। জীবনের সূত্র একদিক থেকে ছিঁড়ে অন্যদিকে যুক্ত করা হয়েছে। সব ঠিক মতো চলছে। কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। জল তেমনি বয়ে চলেছে। ধান তেমনি বেড়ে উঠছে। হাওয়া তেমনি বয়ে চলেছে।

এদিকে মটরু একটু চিন্তিত। জীবনে কখনো সে চিন্তা করেনি, কিন্তু আজ সে চিন্তিত। আজ তার বোনের বিয়ে। এই শুভদিনে কোনো বিঘ্ন না হয়। হীরামনকে তাহলে কী করে মুখ দেখাবে সে? মা গঙ্গার প্রতি ভক্তি যেন আরো বেড়েছে। উঠতে-বসতে, জাগতে-ঘুমোতে বার বার একই কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয়, 'মাগো, আমার নৌকো পারে লাগিয়ে দাও মা।'

মেয়ে আর বোনের ভার যে কেমন হয়, আজ সে বুঝতে পারছে। খাওয়াতেও রুচি নেই তার। তার স্ত্রী ও বৌদি জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, 'ভালো লাগে না। ভাবছি, বোন চলে গেলে আমার ঘর কত খালি হয়ে যাবে।'

'তাহলে যেতে দিচ্ছ কেন? আটকে রাখো।' স্ত্রী পরিহাস করে।

'কী করব বল, এই নিয়ম। 'রঘুকুল রীতি সদা চলি আই'...' গুণ গুণ করতে করতে সে সেখান থেকে চলে যায়। বাইরে বেরিয়েই আবার বলে, 'মাগো, পার কর মা।...'

মা বোধ করি ছেলের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। অবশেষে সেইদিন এলো। সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে সিসবন ঘাটে বরযাত্রীর নৌকো এসে পৌঁছয়। নাপিত, পুরোহিত, বর ও পাঁচজন বরযাত্রী। বাজনা বাদ্যি কিছুই নেই। যেন সাধারণ কিছুযাত্রী এসে ঘাটে নামল।

সারা দিন, সারা রাত ঝাউ বনের হাওয়া শানাই বাজাল। মা গঙ্গার ঢেউ চাষী-বৌদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মঙ্গল গীত গাইল। বসন্তের হাওয়ায় বিরহের সুর। সারারাত টুপটাপ করে মধুর মতো শিশির ঝরল।

জঙ্গলের ছোট ছোট পাখিরা নদী তীরের বড় পাখিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রভাতী গান করতেই বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হল।

নববধূ লখনার মাকে জড়িয়ে ধরে ঠিক তেমনি কাঁদল যেমন সে একদিন নিজের

মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের যেমন চুমু খেয়ে আদর করেছিল, সেই ভাবেই লখনা ও ননহেকে আদর করল। তারপর পূজনের সঙ্গে দেখা করল। মটরু ছুটোছুটি করে সব ব্যবস্থা করছিল। কী জানি কেন তার বড় ভয় করছিল। বুঝতে পারছিল না, বোন যদি তার পা ধরে কাঁদে, সে কী করবে তখন।

দরজার কাছে পাল্কি এসেছে। বিদায়ের সময় উপস্থিত। বোন দাদার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখন সে কোথায় পালাবে?

মন শক্ত করে সে এসে দাঁড়াল। বোন দাদার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। লখনার মা তাকে ওঠানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই মটরুর পা ছাড়ছে না। মটরু মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে সে যে কত কান্না কাঁদল, তার হিসেব কে রাখে?

শেষকালে সে যখন তাকে ধরে ওঠানোর জন্যে ঝুঁকল, তখন দু ফোঁটা চোখের জল মাটিতে ঝরে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে মাথা রেখে তার হীরামন বলল, 'তুমি সঙ্গে যাবে তো?'

'এ কী বলছিস বোন?' লখনার মা চিন্তিত হয়ে বলে, 'এঁর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে।' মটরু তাকে থামাতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে বলা হয়ে গেছে। নববধূ মাথা তুলে দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'না দাদা, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। বোনকে মনে রেখো। মা, বাবা, ভাই, সকলকে হারিয়ে তোমাকে পেয়েছি। তুমি ভুলে গেলে কোথায় যাবো?'

'না রে হীরামন, তোকে ভুলে থাকব কী করে? তুই ভয় পাস না। আমি...' মটরু আর কিছু বলতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে যায়।

নদীর ধার পর্যন্ত যেতে যেতে মটরু গোপীকে বোঝাতে থাকে। গোপী তাকে আশ্বাস দেয়, চিন্তার কোনো কারণ নেই। সে সবরকমে প্রস্তুত। কিন্তু মটরু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার শুধু একটাই কথা মনে পড়ছে, 'তোমার উপরে যতটা ভরসা হয়, ততটা ওর উপরে হয় না।' নৌকো চলে যায়। চাষী, চাষীবৌ আর ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে মটরু তাকিয়ে থাকে। তার উদাস চোখ যেন ওপারে, অনেক দূরে এক ঝড়ের সঙ্কেত পাচ্ছে। সেই ঝড় তার বোনকে গ্রাস করবে। হায়, কেন সে তার সঙ্গে গেল না?

□

বাড়ি ফিরে উদাস মটরু চাটাই পেতে শুয়ে পড়ল। চারিদিকে বিষণ্ণ রোদ। এক ধারে দুধের ঘড়া রয়েছে। তার উপর মাছি ভন ভন করছে। ক্লান্ত গৃহিণীর কোনো হুঁশ নেই। সত্যি, বাড়ি খালি হয়ে গেছে। মটরুর মনে বিষাদ ছেয়ে যায়। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছে, বোনের সঙ্গে সে গেল না কেন?

কিছুক্ষণ পরে মটরুর স্ত্রী উঠে পড়ল। এইভাবে বসে থাকলে কী কাজ চলবে? সব কাজ পড়ে রয়েছে। স্বামীর কাছে এসে বলে, 'যাও, স্নান করে এসো। কতক্ষণ এইভাবে পড়ে থাকবে?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।' মটরু আনমনা হয়ে বলে, 'আমার ওদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। কে জানে বেচারীর কী অবস্থা হবে।'

'গোপী কী পুরুষ নয়?' একটু রাগত ভাবেই মটরুর স্ত্রী বলে, 'তুমি শুধু শুধু চিন্তা করছ। ওঠো।' বলে সে তার গায়ের চাদরটি ধরে টানতে থাকে।

'পুরুষ হলে কী হয়। তারই তো মা-বাপ, সে কখনো তাদের প্রতি কঠোর হতে পারবে না। আমার ভয় করছে। গোপী যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তো আমার হীরামনের কী হবে? আমার যাওয়া উচিত ছিল, তাই না লখনার মা?'

'কিছু হলে ঠিক খবর পাবে। এখন ওঠো তো। কত বেলা হল। সংসারের সব কাজ পড়ে আছে।' অন্দরে গিয়ে সে ধুতি-গামছা এনে তার হাতে দেয়। মটরু কোনোরকমে উঠে নদীতে যায়। আজ গঙ্গাস্নানেও সেই আনন্দ নেই। জীবনে প্রথম এই অনুভূতি হল। তার মনে হচ্ছিল মা গঙ্গাও আজ উদাস। তার স্রোতে সেই জোর নেই. তার ঢেউ-এ সেই উচ্ছ্বাস নেই। কোথাও কোনো তার ছিঁড়ে গেছে, যন্ত্র আর সুরে বাজছে না।

'তোমার কাছে থাকলে একটুও ভয় করে না,...যখন ভাবি আবার ঐ বাড়িতে গিয়ে না জানি কোন দুরাবস্থায় পড়ব, তখন বড় ভয় করে।...তুমিও কিছুদিনের জন্যে আমার সঙ্গে যাবে তো? তোমার উপর যতটা ভরসা হয়, ওর উপর ততটা নয়।' মটরুর মনে কথাগুলো ফিরে ফিরে আসছিল, আর তার মনে হচ্ছিল সব জেনেশুনে সে তার হীরামনকে ঐ বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। মন ব্যথায় টনটন করছে। কেন, কেন সে সঙ্গে গেল না? কেন একলা যেতে দিল? কেন সে তার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করল?

ওয়ারেণ্ট! এখানে তার কর্তব্য! তার কিছু হয়ে গেলে তার সঙ্গীদের কী দশা হবে? সঙ্গীরা আর আগের মতো বোকা নেই। তাদের এবার নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত। মটরু কী তাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবে? মটরুর জীবনে আগে একটাই কর্তব্য ছিল, এখন দুটো। তাকে দুটো কর্তব্যই পালন করতে হবে। দু দিকে দুই শত্রু। একজনের নিষ্ঠুর থাবার চাপে কতশত চাষী নিষ্পেষিত হচ্ছে, অন্যজনের হিংস্র মুখ গহ্বরে বন্দী তার বোন অশ্রুপাত করছে। এক নয়, অনেক। সকলের জন্যে পথ নির্মাণ করতে হবে।

ঘাটে বসে আনমনা মটরু আকাশ-পাতাল কত কী ভাবছিল, পূজন এসে বলল, 'দিদি তোমাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি চলো। কখন থেকে এখানে বসে রয়েছ।' বলতে বলতে পূজন মটরুর ছেড়ে রাখা ভিজে ধুতি হাতে উঠিয়ে নেয়। যেতে যেতে মটরু

বলল, 'পূজন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'করো।'

'আমি যদি না থাকি, তোরা সব সামলে নিতে পারবি না?'

'তুমি থাকবে না কেন? তুমি কখনো গঙ্গার ধার ছেড়ে চলে যেতে পার?'

'না, সে আমি পারি না। কিন্তু মনে কর, যদি না থাকি।'

'বাঃ, কী করে মনে করব?'

'সেবার যেতে হল না? আমি কী গঙ্গার ধার ছেড়ে যেতে পারি? কিন্তু পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, কী করব? ধর যদি সেই রকম...'

'এসব কেন হবে দাদা? তুমি তখন একলা ছিলে। এখন আমরা একশোজন তোমার সঙ্গে রয়েছি। আমাদের প্রাণ গেলেও তোমার গায়ে হাত দিতে দেবোনা। তুমিই তো আমাদের প্রাণ।'

'সে সব তো জানি, কিন্তু...'

'না দাদা না। এরকম আর কখনো হবে না।'

'উঃ, তোর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল পূজন! ধর, আমি যদি মরে যাই।'

'দাদা', পূজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'এমন কথা মুখেও আনবে না।'

'পূজন!' গম্ভীর, বিহ্বল কণ্ঠে মটরু বলে, 'মা গঙ্গা, তাঁর মাটি, এখানকার এই ক্ষেত, হাওয়া, জল, জঙ্গল আর চাষীভাইদের সঙ্গ আমার বড় প্রিয়। আজ হঠাৎ মনে হল যদি আমি কখনো এখানে না থাকি, অত্যাচারী জমিদার কী আবার সব কেড়ে নেবে?'

'না দাদা না! যদি এই তোমার চিন্তা, তাহলে জেনে রাখো, তোমার সঙ্গীরা নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দু দিয়েও এইসব রক্ষা করবে। হারিয়ে যাওয়া দিন যেমন ফিরে আসে না, তেমনি এই জমি কোনোদিন জমিদারের দখলে আসবে না। আমাদের জোর দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমাদের লোকবল বাড়ছে। পৃথিবীও এগিয়ে চলেছে। না দাদা, এমন কক্ষণো হবে না। এখানকার প্রতিটি চাষী আজ মটরু হতে চায়। তুমি একটুও চিন্তা কোরো না।'

'শাবাশ!' মটরু পূজনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'আজ আমি খুব খুশী পূজন। এই তো চাই।' আর সত্যিই তার উদাস ভাব কেটে গেল। মুখে হাসি, চোখ উজ্জ্বল। কিন্তু ঝুপড়িতে ঢুকে সে আবার উদাস হয়ে গেল। রান্নাঘরে পিঁড়ে পেতে, ঘটিতে জল দিয়ে স্ত্রী ডাকল, 'খেতে এসো।'

'খেতে ইচ্ছে নেই।'

'ইচ্ছে থাকবে কী করে, তোমার হীরামন চলে গেছে যে!'

'না, সেজন্যে নয়।'

'তবে?'

'কী জানি মেয়েটার উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে।'

'কী ঝড় আবার বইবে, জানো না, 'আমি তুমি রাজী, তো কী করবে কাজী?' গোপী তার সঙ্গে আছে, কে তার কী ক্ষতি করবে?'

'সে ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর। কত লোকের জীবন নষ্ট করেছে। আর গোপীটা একটু দুর্বল। তা না হলে ওদের গল্প কী এত লম্বা হত? গোপী সেদিন কূয়ার ধারেই শুয়েছিল; তা যদি না থাকত গল্পের তো সেখানেই শেষ। যে সময়ে গোপীর মা তার বৌকে গালাগালি দিচ্ছিলেন, সেই সময়েই যদি গোপী সাহস করে এগিয়ে গিয়ে তার বৌদির হাত ধরে বেরিয়ে আসত, তাহলে কে কী করত তার? কিন্তু সে তো তা করতে পারেনি। স্ত্রীলোক একবার যদি পুরুষের উপর বিশ্বাস হারায়, তাহলে সেই বিশ্বাস আর ফিরে আসে না। হীরামন বলত না, 'তোমার উপর যত ভরসা হয়, ওর উপর ততটা হয় না।'

'তাই বলে কী ও তোমার উপর ভরসা করে জীবনটা কাটাবে?'

'আরে না না। তা কেন? তবে এই সময়ে আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে ওদের। দু চার দিনেই এই ঝড় থেমে যাবে। তখন নিজে থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' 'সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন যাও।' বাটিতে গরম দুধ ঢালতে ঢালতে স্ত্রী কথা শেষ করে, 'আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব আমরা কী করিনি?পরের জন্য কে এত করে?'

'লখনার মা, তুই মেয়ে মানুষ, তাই আমাকে আর বাচ্চাদের ছাড়া কাউকেই আপন ভাবিস না। আমি যদি কাউকে আপন করে নিই, তখন তুইও তাকে আপন বলিস। আমার ইচ্ছেই তোর ইচ্ছে। কিন্তু তোর মন এত বড় নয় যে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে, নিজের ইচ্ছেতে কোনো পরকে আপন করিস। গোপীর বৌদি যতদিন এখানে ছিল, তুই তাকে আপন করেছিলি, কারণ আমি তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু মন থেকে তুই তাকে আপন ভাবিসনি। লখনার মা, মনে কর তুই কোনো বিপদে পড়েছিস, আর সাহায্য করতে আমি যদি না যাই?'

'এখন চুপ কর তো। খেয়ে নাও, তারপর যত ইচ্ছে বকবক কোরো।'

ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও মটরু খেয়ে নিল। তার স্ত্রীর কোনো দোষ নেই। সে যেমন, তেমন ব্যবহারই সে করে। না খেয়ে তার মনে কষ্ট দেওয়ার কী দরকার?

বাইরের রোদে চাটাই বিছিয়ে, হুঁকোয় তামাক সেজে মটরুর স্ত্রী রেখে যায়। মটরু তামাক খেতে খেতে ভাবে, ভাবতে ভাবতে ঢুলুনি আসে। সারারাত জেগেছে। হুঁকো, কল্কে ছড়িয়ে পড়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মটরু গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। স্ত্রী এসে গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে যায়।

□

ক্রমশঃ সন্ধ্যা নামে। কোথা থেকে একটা অসহায় টিয়া পাখি তীক্ষ্ণ সুরে টিঁ টিঁ করে

ডাকতে ডাকতে মটরুর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। কী এক দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠে মটরু ডেকে উঠল, 'পূজন! পূজন!'

দৌড়ে এসে পূজন বলল, 'ঝড় আসছে দাদা। উত্তরের আকাশ কালো হয়ে গেছে!' টিয়াপাখির চিৎকার তখনও আকাশে অনুরণিত হচ্ছে। মটরু চাদর ফেলে উঠে পড়ল। তারপর এদিক ওদিক দেখে বলল, 'পূজন, আমার একটা হীরামণ ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়েছে। শুনতে পাচ্ছিস তার চিৎকার?' বলেই সে সিসবন ঘাটের দিকে দৌড়ল। দরজায় দাঁড়িয়ে স্ত্রী চেঁচিয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?' পূজন ডাকল, 'এই ঝড়ে কোথায় চললে?' ফিরে তাকিয়ে মটরু বলল, 'এক্ষুণি আসছি।'

ঝড় এসে গেল। গঙ্গার ঢেউ উদ্দাম হয়ে উঠেছে। হাওয়া বইছে শন শন করে। জঙ্গলের মাথা দুলছে। ঝুপড়িগুলোর প্রায় পড়ে যাওয়ার অবস্থা।

ঘাটে এসে মটরু মাঝিকে বলল, 'নৌকো খোলো তাড়াতাড়ি।'

'পালোয়ান ভাই, এই ঝড়ে? কী বলছ তুমি?' বিস্ফারিত চোখে মাঝি বলে।

'কিচ্ছু হবে না। এ তো আমার মায়ের কোল। লগি ওঠাও। আমার তাড়া আছে! দাও দাও, আমাকে দাও। তুমি চুপ করে বোসো। মটরু নৌকো খুলে দেয়। দেখতে দেখতে ঝড়ের উন্মত্ত ঢেউ-এ তার নৌকো অদৃশ্য হয়ে যায়।

□

গোপীর দরজায় যখন মটরুর লাঠির শব্দ হল, তখন ঝড় থেমে গেছে। বাড়ি নিস্তব্ধ। প্রতিবারের মতো বুড়ো এবার সাড়া দিল না। মটরু নিজেই এগিয়ে গিয়ে বলে, 'প্রণাম হই, বাবুজী।'

বাবুজী চুপ করে থাকেন।

'রাগ করেছ বাবুজী? নতুন বৌ পছন্দ হয়নি? সে তোমার বড় বৌ-এর মতো নয় কী? আমি তোমাকে বলেছিলাম না?'

'আমার সামনে থেকে দূর হ!' বুড়ো খেঁকিয়ে ওঠে।

'কী করে দূর হব? আমি তোমার কুটুম না?'

'আমার নাক কাটিয়ে, এখন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এসেছিস? যা, সারা গাঁয়ে ঢ্যাডরা পিটে আয়। বাকী আর রইল কী? আমাকে আগে মেরে ফেলতে পারলি না চণ্ডাল?'

'এমন কথা কেন বলছ বাবুজী? তুমি একশো বছর বেঁচে থাকো। সেদিন তুমিই তো বলেছিলে, 'বড় বৌ-এর কথা ভেবে বুক ফাটে, মা-বাপের কাছে ছেলের চেয়ে বড় কী আর কিছু? আত্মীয়রা কী আমাদের খাওয়াবে?...আমরা কী তার মনের খবর জানতাম...' এখন তো জানো। এখন তো তোমার বুক ফাটা উচিত নয়। কিন্তু তুমি

তো...'

'চুপ কর। কী করে জানব যে তোদের সব কটার মাথা খারাপ...' মটরু হাসল। বলল, 'মাথা খারাপ তোমার, আর তোমার সমাজের। কিন্তু যারা তোমাদের পাগলামি সারিয়ে একজন অসহায় মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে, তোমরা তাকেই পাগল বল।'

'এইসব তুই তাকেই শোনা। আমার সামনে থেকে সরে যা।'

'কোথায় সে?'

'চাতালে'।

'চাতালে? ঘরে নয়?'

'আমি বেঁচে থাকতে ওকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেব না।'

'তাহলে জেনে রাখো, তার আরও একটা বাড়ি আছে। চাতালে থাকবে কেন? আমি এক্ষুণী...'

'আমাদের বাপ-ব্যাটার ঝগড়ায় তুই আসছিস কেন? তুই চলে যা না।'

'এটা বাপ-ব্যাটার ঝগড়া নয়। সমাজের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বিধবার সংগ্রাম। আমি আমার বোনের কাছে এসেছি।'

'আমার ছেলেও আছে...'

'কোন ছেলে? যাকে তুমি বাড়ি থেকে বের করেছ?'

'কী চেঁচামেচি করছ সব?' বুড়ি এসে ঝঙ্কার দিয়ে বলে।

'মটরু এসেছে তামাশা দেখতে।' বুড়ো পাশ ফিরে বলল।

'সারা গাঁ থুতু ছেটাচ্ছে। বাকী আর কী আছে?' হাত নেড়ে নেড়ে বুড়ি বলল।

'ওদের নিতে এসেছি।'

'তুই কে যে নিতে এসেছিস? ওর মা-বাপ কী মরে গেছে?'

'আজ জানলাম মরে গেছে। তা না হলে বাড়ি থেকে চাতালে বেরতে হত না।'

'এসব তোমাকে কে বলল?' বুড়ি শান্ত গলায় বলে।

'বাবুজী বলেছেন।'

'ওর কথা কানে নাও কেন? এদিকে এসো।' বলে বুড়ি তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'জেনেশুনে কী কেউ কাদায় পড়ে! কী করব বল, পাড়া-প্রতিবেশী, গাঁয়ের সব লোকেরা এমন ছি ছি করতে লাগল যে বুড়ো ওদের চাতালে বের করে দিল। অনেক সহ্য করলাম, শেষে আর সহ্য হল না। শেষে 'পুরোনো কাসুন্দি' নিয়ে বসলাম। এই গ্রামে আমার চুল পেকেছে। সকলের সব কথা জানি। আমি যখন মুখ খুললাম, তখন সব ল্যাজ গুটিয়ে পালালো। তুমিই বলো, আমার বৌ খারাপ কিসে? সে রীতিমতো ধর্ম শাস্ত্র মতে বিয়ে করেছে। লুকিয়ে চুরিয়ে কোনো পাপ কাজ করেনি তো! ঠিক আছে, ছেলেমানুষ, যদি ভুল করেও

থাকে, তবে ওদের কী মাথা কেটে ফেলতে হবে? আমার ছেলেই তো। তার কত অন্যায় সহ্য করেছি, না হয় আরো একটা করব। একটা হাতে অসুখ হলে কেউ কী হাত কেটে বাদ দেয়? ভগবান যে মালা গলায় পরিয়েছেন, সেই মালা ফেলে দিই কেমন করে? আমি নিজে ওদের ঘরে নিয়ে এসেছি। ওদের ঘর। দেখি, কে বার করে ওদের। আমরা বুড়ো হয়েছি, আজ আছি, কাল নেই। ওদের সামনে তো সারা জীবন পড়ে আছে।...

তুই খেয়ে যাবি তো? গুড়ের পায়েস আর লুচি করেছি।'

মটরু নিচু হয়ে বুড়িকে প্রণাম করে, আর গদগদ কণ্ঠে বলে, 'মা তুমি কত ভালো। বাবুজী তো...' 'একটু রেগে আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাপ ছেলের উপর কতক্ষণ রেগে থাকবে? খাবি তো? যা, মুখ হাত ধুয়ে নে।' 'সে কোথায়?' মটরু বুড়ির কানে কানে বলে। বুড়িও হেসে তার কানে কানে কিছু বলে। মটরুও হেসে ওঠে।

'রান্নাঘরে চল' এগিয়ে যেতে বুড়ি বলে, 'খেয়ে নে।'

'কী করে খাব? আমার ছোট বোন না? তার বাড়িতে কী খেতে পারি?...এবার আমি যাই। মা গঙ্গা ডাকছেন। বাড়িতে সবাই চিন্তা করছে।

ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, আর আনন্দিত দুটি মূর্তি এসে মটরু পায়ের উপর পড়ল। মটরু সস্নেহে আশীর্বাদ করে, 'তোর সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক হীরামন।'

উঠে দাঁড়িয়ে, ঘোমটায় মুখ ঢেকে, লজ্জিত কণ্ঠে হীরামন বলল, 'মা গঙ্গার কাছে ওড়না মানত করেছি। বৌদিকে বোলো আমার হয়ে দিয়ে দিতে।

Lasertypeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi and
printed at Shivam Offset, New Delhi